আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সম্পাদক

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীরণদেব সরকার

৪২তম সংখ্যা ১৩৭৪

সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা—তার রূপ ও রূপায়ণ

রণদেব সরকার
প্রথম বর্ষ : সাহিত্য

সত্যের ভিত্তিতেই সাহিত্যের প্রাণ—সাহিত্যকে তাই প্রকাশ ও সংযমের নামে একটা বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে যা জীবন ও সমাজবিমুখ এমন কিছুই যেন সাহিত্যের নামে চালান না হয় যা সাহিত্যের গতিপ্রবণতাকে ক্ষুণ্ণ করে। সাহিত্য, যেহেতু এই সমাজব্যবস্থার অন্তর থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত, এবং যেহেতু সাহিত্যের উপজীব্য এই সমাজের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত মানুষ, সেহেতু মানুষ ও জীবনের অনুগামী হয়ে এসে পড়বে যুগদর্শন। সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কিছু মৌলিক আলোচনা করতে হ'লে আমাদের তাই প্রথম কর্তব্য হবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে যুগের পরিপূরক প্রগতিশীল পথে চালিত করা।

সাহিত্য কি? না, সাহিত্য সত্য, ন্যায় ও বাস্তবের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এক অনবদ্য সংস্কৃতি। সাহিত্য গতি, সাহিত্য মুক্তি। সাহিত্য মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের প্রতিকৃতি। সাহিত্য শক্তি—অগ্নিবচন, অভয়মন্ত্র। সাহিত্য কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সহিত+ষ্ণ্য, অর্থাৎ সাহিত্য সেই আধার যা আমাদের "সহিত" অবস্থান করে। এখন প্রশ্ন, কার "সহিত"? না, মানুষের "সহিত", সমাজের "সহিত"। যে মানুষ দিকে দিকে তার পদচিহ্ন রেখে যাচ্ছে, বুকের রক্ত ঢেলে সৃষ্টি করছে সভ্যতার নতুন নতুন অধ্যায়, নোনা-ধরা মাটিতে লাঙল চালিয়ে উৎপন্ন করছে সোনার ফসল; সেই মানুষের অন্তর ও বহিরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ ও হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির মূর্ত রূপকার সাহিত্য। সেই অর্থে সাহিত্য কখনই সমাজ ও মানুষ থেকে বিচ্যুত কেবলমাত্র এক অদৃশ্য নিরাকার সচ্চিদানন্দ ভাবলোকের গোলার্ধকে রূপায়ণ করতে পারে না সাহিত্যের মাধ্যমে। কেন পারে না, সে বিষয়ে পরে আসছি। তার আগে সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের গতানুগতিক ধারণা কি চলে আসছে এবং যুক্তিতর্কের উত্থাপনের পর সাহিত্যসৃষ্টিতে তা সত্যই কতটা প্রযোজ্য, আমাদের সে বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন।

সাহিত্য সম্বন্ধে এই গতানুগতিক ধারণা কি? না, সাহিত্য সত্য, শিব ও সুন্দরের সম্মিলনে উদ্ভূত এক শাশ্বত অমৃতকুম্ভ। সাহিত্যের আস্বাদন গন্ধময়, রূপময়, সঙ্গীতময়

সূচীপত্র

কবিতা

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ	শ্রীদিনেশ দাস	১
সাদা ঘোড়ার সওয়ার	অধ্যাপক শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	২
ভাল এই	শ্রীশোভনলাল সেনগুপ্ত	৫
ইতিহাস	শ্রীভবানীপ্রসাদ দে	৬
হরিণের চোখে তীর	শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	৭
পরাজিত কামনারা ফিরে আসে	শ্রীকুণাল চট্টোপাধ্যায়	৮
আমার ঘরে ভ্রমর এল	শ্রীপঙ্কজকুমার বসু	৯
হারিয়ে যাওয়ার আগে : একটি মুহূর্ত	শ্রীরণদেব সরকার	১০
ঝরনারা কথা বলে	শ্রীজয়ন্ত ঘোষ	১১
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও	শ্রীঅপূর্ব মুখোপাধ্যায়	১২
বিচিত্রা	শ্রীসুশীলকুমার বশিষ্ঠ	১৩
আলোর স্বপ্ন	শ্রীঅশেষ রায়	১৪

প্রবন্ধ

উদ্ভিদের সাহায্যে খনিজ পদার্থের সন্ধান	অধ্যাপক শ্রীঅজয়কুমার সেন	১৬
মহাজীবন, মহামরণ	শ্রীশশাঙ্কশেখর ঘোষ	১৭
ভাল্টনগঞ্জ ঘুরে এলাম	শ্রীতরুণকুমার ঘোষাল	১৯
সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা—তার রূপ ও রূপায়ণ	শ্রীরণদেব সরকার	২২
জনগণদরদী স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়	৩০
পরীক্ষা ভণ্ডুল প্রসঙ্গে	শ্রীবিধান চট্টোপাধ্যায়	৩৩
ভূতত্ত্বের সন্ধানে	ভূতত্ত্ব বিভাগের জনৈক ছাত্র	৩৬
ভিয়েৎনাম যুদ্ধের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব	শ্রীপবিত্রকান্তি দে সরকার	৩৮
পাই	শ্রীমিলনকান্তি দাশ	৪০
আমি অভিনয় ভালবাসি	শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৩

গল্প

শিলাবৃষ্টি	শ্রীসুব্রত ভদ্র	৪৬
অসমাপ্ত টেলিফোন	শ্রীমন্টু পাল	৪৮
ঘুম	শ্রীপ্রণব চক্রবর্তী	৫১

জড় চিন্তা থেকে তাঁরা কিছুতেই নিজেদের বিচ্যুত করতে পারেন নি। কেবলমাত্র কতকগুলো অলৌকিক তত্ত্বের কচ্‌কচি থেকেই সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করতে চান তাঁরা, কিন্তু আবার সাম্প্রতিক যুগ, কাল ও সভ্যতার পাদপীঠে বসে ওসব একেবারে নকল করা চলে না, তাই বেশ প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েই তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। অনেকে জীবন সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতা আহরণ না করেই—বাস্তব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সজাগ না হয়েই—সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। প্রচারের বন্যায় ভাবকের অভাব নেই হয়তো। চারিদিকের ভ্রষ্টতা, ন্যায়নীতির পঙ্কিলতার মাঝেই সুমিষ্ট শরবতের বদলে তেতো পাচন বিলোচ্ছেন এঁরা।

সমাজ কি? সমাজ বিশেষ সময়ে, বিশেষ কালে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট মানুষের সম্মিলিত জীবনের সম্পূর্ণ আধার। সমাজ হচ্ছে "a collective mirror of life"। অতএব মানবজাতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিবিড়—তাই ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখের যা দ্বন্দ্ব আমরা পার্থিব দর্শনে পাব তা সবই মানবকেন্দ্রিক। মানুষের মনের আশা-নিরাশার, লোভ-জিঘাংসার, ঈর্ষ্যা ও হিংসার প্রতিকৃতি এই সমাজ। তেমনি সংবৃত্তিরও। এখন, মূল প্রশ্ন, এখানে কি কোন supernatural divine power থাকতে পারে যা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চিন্তা, কল্পনা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা রাখে? মুশকিল হচ্ছে এই, যে, আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল সাহিত্যের ধ্বজাধারীরা সবকিছু স্বীকার করেও, সমাজের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক অস্বীকার না করেও, এমন সব সাহিত্য-কীর্তির নমুনা আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান যা আমাদের মনে এই ধারণাকে বেশ ভালভাবেই গেঁথে দেয় যে সেই অদৃশ্য শক্তিই আমাদের সকল কর্মের নিয়ন্তা। "There is a nemesis which regulates this system," এই ধারণাটা বেশ রস-উদ্দীপক ও আর্ট আর্ট করে বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে সাহিত্যে এর সূক্ষ্ম প্রয়োগ করে কিছুটা বাহবাও হয়তো লোটা যায়, তবে তা ঐ বই-এর পাতাতেই আবদ্ধ থাকে। সমাজের বিকাশের স্বার্থে তা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যায় না, জন্ম দেয় না এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গীর যা সমাজকে প্রগতির স্বার্থে পরিচালিত করে। হ্যাঁ, কোন কিছু সৃষ্টি করার, তা ভাল হোক কি মন্দই হোক, গণতান্ত্রিক অধিকার আমার আছে বটে, তবে সে সৃষ্টি যেন এমন কোন চিন্তা বহন না করে যা সমাজকে অনাসৃষ্টির অন্ধকারে ঠেলে দেয়। সাহিত্য তখনই সাহিত্য যখন তা সমাজকে প্রগতির পথে, নবজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়; সমাজের জীবনের বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করে প্রগতিশীল আশাবাদী মন যা মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দেয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ পার্থিবতাকে ভেঙ্গে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে অনুপ্রাণিত করে।

বিশুদ্ধ সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা খুবই সঙ্গত যে যেখানে সমাজটা অবক্ষয়ের অতলগর্ভ অন্ধকারের রাজ্যে তলিয়ে যাচ্ছে, একটা দুর্নীতির আবিলতা

ক্যামেরার দৃষ্টিতে

অ্যাসেম্‌বলী হল্
হায়দারাবাদ

চার মিনার
হায়দারাবাদ

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
হায়দারাবাদ

হায়দারাবাদের আলোকচিত্রগুলি
কলেজের পুরাতন ছাত্রাবাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত

সাহিত্যের একঘেয়ে কচ্‌কচি থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেই সমস্যা ফুরিয়ে গেলে তো আর ভাবনা ছিল না। প্রশ্ন, তাঁরা এই সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, না আরও গাঢ় অন্ধকারের রাজ্যে ঠেলে দেবেন? তাঁদের যুক্তি যে মানুষ জীবনের এই দিক্‌টার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এর প্রতি বিতৃষ্ণ হবে, নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম দেবে। উদাহরণ হিসাবে আবার এমিল জোলাকে উদ্ধৃত করার মধ্যে এঁরা কেমন করে পেলেন তা আমরা বুঝতে পারি না। এমিল জোলার নায়ক যখন 'ফার্স্ট্'-এর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে শেষে তার নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে আগাগোড়া সমাজের মানসিক বিকারকে উন্মুক্ত করার তখন একটা সৎ অব্যবসায়িক প্রয়াস পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নায়ক তখন এমন কিছু একটা অনুভব করে যা উপরিলিখিত সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নায়কের মনের দর্পণে সুলভ নয়।

তাই এইসব নাম কেনারু সাহিত্য মেরুদণ্ডহীন যুবমানসকে অন্ধকারের সুড়ঙ্গ দিয়ে এগিয়ে চলার, জীবনের কানাগলির সন্ধান দেওয়ার কাজেই নিজেদেরকে নিযুক্ত রাখতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। অশ্লীলতার জলা জমির উপর দাঁড়ানো এই সাহিত্য যুবমানসকে আরও অস্থিরচিত্ত করে তুলবে। যাক্ সে কথা। আমাদের উদ্দেশ্য, বাস্তববিচারে ও সত্যের বিচারে সাহিত্য কতটা বস্তুতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল হ'তে পারে। পর্নোগ্রাফীর এই বিশেষ দিক্‌টার সম্বন্ধে আলোচনা করলাম এই জন্য, যে, এইরকম অর্থহীন বাস্তবতা সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের মাপকাঠিতে প্রযোজ্য কিনা এবং তা সত্যসত্যই বস্তুচেতন সাহিত্যের দাবী করতে পারে কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

আমাদের সমাজের সাম্প্রতিক কাঠামোটা কি? একদিকে পুরাতন মূল্যবোধের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর জীবনের বিবিধ সমস্যার ক্রমাগত সংঘাতের ফলে নৈতিকতার ভিত্তিতে একটা সুসংবদ্ধ আদর্শের ক্ষেত্র ভেঙ্গে পড়েছে, আর একদিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সামাজিক সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে যুগমানস দিশাহারা হয়ে পড়েছে। অনিশ্চয়তার একটা বিশাল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, যুবমানসের শিরায় উপশিরায়। এখানে একদিকে যেমন গান্ধী কিংবা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, অর্থাৎ পুরাতন মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি ও সংস্কৃতির আনুগত্য থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছি, অপর দিকে ক্রমাগত দোদুল্যমান সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় আমরা ঘুরপাক খেয়ে মরছি। এখানে মানবিকতার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত নেই, আছে কেবল কতকগুলো ভ্রান্ত দিশেহারা জীবনযাত্রার পথে বঞ্চিত নৈরাশ্যের জীবনবেদ, একটা চেষ্টাকৃত 'সিনিক' বিষণ্ণতা। দুঃখ, জ্বালা ও যন্ত্রণার মধ্যেও আমরা সত্যের আলোকে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাব— এটুকু চিত্তের স্থিরতা, এটুকু সুস্থ বিবেচনাশক্তিও আমাদের নেই। খালি দুঃখ, হতাশা,

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ

দিনেশ দাস

প্রাক্তন ছাত্র

একটি মুহূর্ত শুধু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার
অনন্ত বিশাল এক প্রাণের প্রবাহ
কালহীন। সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের সম্ভার
অখণ্ড জীবন-মৃত্যু নদী-হিমবাহ।

মৃত্যু শুধু রক্তজবা-কুসুম সঙ্কাশ
সূর্যোদয় চেতনার অন্য এক স্তর :
সহসা আবিষ্কৃত আর এক আকাশ
আরো এক প্রাণস্পন্দ প্রাণের ভিতর।

ভবিষ্যৎ-বর্তমান-অতীতের তীরে
নৃসিংহ বরাহ কূর্ম মীন অবতার
পার হয়ে : সৌরলোকে আলোকে তিমিরে
অদৃশ্য স্ফটিক আলো লীলার বিস্তার।

সেই নিত্যলীলা চলে অন্তরঙ্গ মনে,
কবির ব্রহ্মাণ্ড জাগে কোনো ব্রাহ্মক্ষণে।

যায় যে এই মতবাদে লক্ষ্য উদ্দেশ্যবাদ। অর্থাৎ কিনা মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া। এর পাল্টা প্রশ্ন করা যায়—গতানুগতিক সাহিত্যের উদ্দেশ্যটাই বা কি? আসলে কোন সাহিত্যকে এই রকম সংকীর্ণভাবে বিচার করলে চলে না। কোন সাহিত্যেই তথাকথিত উদ্দেশ্যবাদ থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি বলেন মার্কসবাদী সাহিত্যে উদ্দেশ্যবাদটাই প্রধান, আমি তবে বলব সেই অর্থে এই ধরনের সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যই প্রধান। এবং এই লক্ষ্যের রূপায়ণে, তথা সমাজপ্রগতির পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এই সাহিত্য একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোরই সাধনা করে। তা বলে যেন মনে করা না হয় যে একটা অচ্ছেদ্য লৌহনিগড়ে আবদ্ধ এই লক্ষ্যবাদ। আসলে ঠিক তার উল্টো। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার অঙ্কবিন্দুকে বার করার সাধনায়, একটা ন্যায়নীতি ও প্রগতির বিশাল পতাকাতলে সমাজের রূপান্তরকে নিয়ে যাওয়ার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে এ দৃঢ়চেতা। তথাকথিত অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিকদের মত কতকগুলো খাপছাড়া জীবনদর্শনকে এলোমেলোভাবে চিন্তা করার শিক্ষায় এ সাহিত্য নিযুক্ত নয়। একে বলা যেতে পারে "A concretised version of life"। এখানে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করলে আমার বক্তব্য হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় এক জায়গায় বলেছেন :

"মানবমনের স্বাধীনতা ও মর্যাদাবোধ ঘুচাইয়া তাহাকে যদি কলুর চোখে ঢাকা বলদের মত কোনো মার্কসীয় অথবা যে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদের ঘানিতেই ঘুরানো হয়, তবে সে মনের নব নব উন্মেষ—অপূর্ব বস্তুদর্শন ও নির্মাণের ক্ষমতা চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে। ফলে সে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। পথ হারাইবে।"

আমি এই যুক্তি মানতে পারছি না। যেখানে মার্কসবাদের শিক্ষা পঙ্কিল, ঘুণ-ধরা, নৈরাশ্যবাদী সমাজকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ে তোলা, এবং সেই গড়ে তোলার কাজ সাহিত্য তথা সংস্কৃতি তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর স্থাপিত, সেখানে তা মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাবোধকে কি করে কলুর বলদের মত ঘানিতে জুড়ে দিতে পারে তা বিচারসাপেক্ষ। তবে একটা কথা ঠিক, যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মর্যাদাবোধের ভিত্তিতে যদি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করা হয় যা ব্যক্তিচিন্তাকে,—তা ভালই হোক কি মন্দই হোক, তা সমাজের প্রগতির স্বার্থের পরিপূরক হোক কি পরিপন্থী হোক,—রূপান্তরিত করে তবে তার সাহায্যে কোনদিন শোষণহীন শ্রেণীহীন প্রগতিশীল সমাজ গঠনের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান সামাজিক পরিবেশের পটভূমিকায় বঞ্চিত শিক্ষাদীক্ষায়, ধনসম্পদে সুবিধাভোগী একদল মানুষের সঙ্গে সমাজের সর্ব অবস্থায় শোষিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত একদল মানুষের পার্থক্যটা কখনই ক্ষুদ্র নয়। তাহলে এই ধরনের ব্যক্তিমর্যাদা তথা ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী

সাদা ঘোড়ার সওয়ার

ক্লান্ত পায়ে চলছিলে তুমি,
আমি যেন সাহস হারিয়ে ফেলছিলাম।
বন্ধুর পথে একসঙ্গে চলছিলাম দু'জন।

আমি তাকালাম তোমার ভীরু চোখের পানে,
দেখলাম তোমার মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর।
মনের ভয় গোপন করে বললাম
পথের পাথরে ব্যথা লেগেছে তোমার পায়ে।

তুমি আমার মুখের পানে তাকালে
হাসির আড়ালে ব্যথা আর ক্লান্তি গোপন করে।
পরম আদরে আমার হাত ধরলে তুমি,
কিন্তু কেঁপে কেঁপে উঠল তোমার সারা দেহ,
আর আমাদের দু'জনকে ক্রুদ্ধ আঘাত হানতে লাগল
উদ্দাম ঝড়ো হাওয়া।

নতুন করে যেন জেগে উঠল বন্য পশু ;
তুমি ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে,
রক্তহীন সাদা হয়ে উঠল তোমার মুখ।
আমার বুকে মাথা রেখে দেহ এলিয়ে দিলে তুমি,
চলার শক্তি হারিয়ে।

"মুখ তুলে তাকাও"—বলে উঠলাম আমি,
বুক কেঁপে উঠল দুরুদুরু।
তুমি ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে
ফেললে দীর্ঘশ্বাস।

এগিয়ে এল এক ঘোড়-সওয়ার,
চোখে তার শান্ত দৃষ্টি।

জনগণদরদী স্বামী বিবেকানন্দ

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

প্রথিতযশা মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের অনন্ত যশ, অনন্ত কীর্তি বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হইয়া আমি "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্"। তথাপি আমি যে অভিলাষী তাহার কারণ "তদ্‌গুণৈকর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ"।

পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার সংস্পর্শে ভারত যখন তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছে, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসসুলভ দুর্বলতা ভারতবাসীর একমাত্র সম্বল হইয়া উঠিয়াছে—ঠিক সেই সময় পরমহংসদেবের আবির্ভাব হয় পুণ্যসলিলা গঙ্গার ধারে, ছায়া-শীতল পঞ্চবটীর মাঝে, প্রেম ও ভক্তির উৎসধারারূপে। তিনি ব্রহ্মলোক মন্থন করিয়া আনিলেন অমৃত আর বিবেকানন্দ সেই অমৃত বিশ্ববাসীদের উপহার দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব, বিবেকানন্দ ভাষা। ভাষা ছাড়া যেমন ভাবকে বোঝা যায় না, তেমনি বিবেকানন্দ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝা যায় না।

বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ, জনগণদরদী স্বামী বিবেকানন্দ! কিন্তু কেমন করিয়া তিনি এই জনগণদরদী হইলেন—সেই পরিণতি উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের মুষ্টিমেয় মহামানবের ইতিহাস,—বিশেষ করিয়া ধর্মের ও সমাজের ইতিহাস জানিতে হইবে। স্বামীজী লিখিয়াছেন—"হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমে যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়"। দুঃখ অর্থে সমবেদনা, সেইজন্যেই দুঃখের উদ্ভব। মহাপ্রেমশালী মহামানব বুদ্ধদেবের জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে তাঁহার বাণী ও উপদেশ জন্মকালের এক হাজার বৎসরের মধ্যে সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নূতন ধর্ম ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন জাতের সৃষ্টি হইয়া এ জগৎ সভ্য হইতে সভ্যতর জগতে পরিণত হইল। বুদ্ধদেবের প্রেম মনুষ্যজাতিকে অতিক্রম করিয়া পশুজগতে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ দেখিতে পাই ছাগশিশুর জীবনরক্ষা, অর্থাৎ পশুবলি নিষিদ্ধকরণ। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে দেখি দক্ষিণেশ্বরে অবর্ণনীয়, অপরিসীম, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছাপিয়া-ফেলা প্রেমলীলা, পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান। গঙ্গার ঘাটে কলহরত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মাঝির পৃষ্ঠে সজোরে চপেটাঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের চীৎকার। দেখা গেল পরমহংসদেবের পৃষ্ঠদেশে মাঝির পৃষ্ঠের পাঁচ অঙ্গুলির চিহ্ন। কি আশ্চর্য অভেদজ্ঞান! ইহার কল্পনাক্ষেত্রে তুমি

ভাল এই

শোভনলাল সেনগুপ্ত

প্রথম বর্ষ : সাহিত্য

বিদ্যুৎ-বেগে ছড়ালো সে নাম পৃথিবীর চারদিকে,
বৈশাখী সম আলোড়িত করে ধ্যানগম্ভীর বন—
যেমন আগুন রাঙায় আকাশ নিজ পরিচয় লিখে,
বন্ধ্যা তুষারে এঁকে দেয় গাঢ় জীবনের স্পন্দন।

তোমার কণ্ঠে শুনেছে পৃথিবী উদ্ধত যৌবন ;
বজ্রমুঠিতে ভেঙেছিলে তুমি দুঃশাসনের কারা,
তোমার বুকের প্রান্তরে ছিল দুর্জয় দৃঢ় মন,
কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তুমি প্রতিবাদী শিরদাঁড়া।

যদিও ওদের নৃশংস গুলি বিঁধেছে তোমার বুকে,
যদিও আজিও গাঁথা হয়নিকো রাঙাকরবীর মালা,
তবুও তোমার পদাঙ্ক ধরে উঠেছে মানুষ রুখে,
সারা পৃথিবীতে হয়ে গেছে শুরু দিন বদলের পালা।

ফাঁসীর মঞ্চে উঠে তুমি সোজা মৃত্যুর মুখোমুখি
মেঘমন্দ্রিত স্বরে করেছিলে উদাত্ত আহ্বান :
তোমার জন্য সাথী এ আমার বুকের সূর্যমুখী
—বৃষ্টি-ঝরানো যেন একখানি মেঘমল্লার গান।

মুষ্টিমেয় লোক সাধারণ লোকদের নিষ্পিষ্ট করিয়া নিজেরা ধন-সঞ্চয় ও মহাভোগের মধ্যে জীবন কাটায়। সুতরাং ভারতে অথবা বহির্ভারতে, অগ্রশীল অথবা অনগ্রশীল জাতির সর্বত্রই জনসাধারণ জীবন্মৃতের ন্যায় জীবনধারণ করিতেছে। ভারতের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী দেখাইয়াছেন তিনটি শ্রেণীর অভ্যুদয়। প্রথমে ব্রাহ্মণদের অভ্যুদয় ও আধিপত্য, পরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অভ্যুদয়কালে প্রত্যেকটি শ্রেণী আপন স্বার্থে জনগণের বুকের উপর দিয়া 'জগন্নাথের রথ' চালাইয়াছে। স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়িল ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য বিধান,—শূদ্রের অভ্যুদয়কাল আগত। তাহাদের অভ্যুদয়ে অতি উচ্চ সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রকাশ। আর সেইজন্যই তিনি শিক্ষাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষার আদর্শ হইবে ভারতের চিরন্তন আদর্শ—আত্মজ্ঞান লাভ করা, —যাহার উপায় ত্যাগ। রামকৃষ্ণের ভাষায় "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। "আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। পক্ষান্তরে স্বামীজীর কথায় ঈশ্বরলাভই ভারতের চিরন্তন আদর্শ। কিন্তু এই ঈশ্বরলাভের উপায় শুধু স্বামীজীর ভাষায়—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

স্বামীজী-প্রকল্পিত শিক্ষার দ্বারা এই ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগব্রতে ভারতবাসী দীক্ষিত হইলে হারানো ভারতের বৈশিষ্ট্য আবার ফিরিয়া আসিবে। অধুনাকালে পাশ্চাত্য অনুকরণের দ্বারা আমরা যে মেরুদণ্ডহীন হইয়াছি তাহাও বিদূরিত হইবে। ক্রমে ক্রমে আসিবে কর্মের ক্ষমতা। তখন দেখিতে পাইব স্বামীজী যাহা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন—"শিরায় শিরায় রজোগুণের তাণ্ডব নৃত্য"—তাহা যথার্থই সত্য। কাজ করিতে হইবে। "কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে" আমরা কেবল বলিব, "হে ওজঃস্বরূপ, আমাদের ওজস্বী কর। হে বীর্যস্বরূপ, আমাদিগকে বীর্যবান্ কর। হে বলস্বরূপ, আমাদিগকে বলবান্ কর।" আর সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে স্বামীজীর ভাষায় "ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।···হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

বিবেকানন্দের বীরবাণীকে অবলম্বন করিয়া আমরা যেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারি—সর্বশেষে বিশ্ববরেণ্য ও পূজ্যঋষির চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া ইহাই কামনা করি।

স্পার্টাকাশের শিলাময় নগরে নগরে ;
রূপকথার শূন্যোদ্যান থেকে
সাগরপারে ভূগর্ভের সমাধিক্ষেত্রে,
যেখানে অশ্রুত মন্ত্রে মৃতেরা জপে চলেছে,
'আমি, আমি, আমি।'

ক্লান্ত যাযাবর আমি
পথের দু'পাশে রেখে যাচ্ছি
আমার কিছু স্মারক,
কালের সংগ্রহশালায় তোমাদের সভ্যতার
নিদর্শন হিসাবে সাজানোর জন্যে।
আমি এগিয়ে চলেছি—
আমারই অতীতের ফসিলকে
আবিষ্কার করার আনন্দে।

হরিণের চোখে তীর

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

"ইজ্ দেয়ার এনিবডি দেয়ার ?"

ঘুমের পর্দাটা সরাতেই
এক ঝাঁক রোদ আমার চোখে—
টিক্‌টিক্ ঘড়িটার প্রেম কিছুটা এগিয়ে
মুখ থুবড়ে পড়েছে—যখন মৌমাছিটা
ফুলের বুকে।

* * *

বিমর্ষ সন্ধ্যার আরতিতে সুগন্ধ
ধূপছায়ার পথে বিলীন—কৃষ্ণচূড়ার

...লেজের ছাত্রসংসদের উদ্যোগে ১৯৫৯ খাদ্য-আন্দোলনের শহীদ স্মরণে 'শহীদ দিবস' পালিত হয়।

'শহীদ দিবসে' ময়দানের জমায়েতে যোগদানকারী কলেজ ছাত্রদের মিছিলের একাংশ। মিছিলের নেতৃত্ব করেন ছাত্রসংসদের সম্পাদক শ্রীকার্তিক সাহা।

একাঙ্ক নাটকাভিনয় প্রতিযোগিতা

বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত একাঙ্ক নাটকাভিনয় প্রতিযোগিতায় কলেজের নিম্নলিখিত ছাত্রবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন :

...সারিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রবৃন্দ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক—(বাঁ দিক থেকে) তন্ময় ঘোষ, সুশীল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায় (ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক), সুভাষ দত্ত, প্রণব চক্রবর্তী ।

...র সারিতে—(বাঁ দিক থেকে) বিকাশ চক্রবর্তী, তরুণ ঘোষাল, দিলীপ মাইতি, বিবেক রায়, অরূপ সাহা, জন্মেজয় বসু (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), কার্তিক সাহা (সাধারণ সম্পাদক), [illegible] কর্মকার ।

আমার ঘরে ভ্রমর এল

ভিজে আঁধারের চুলে অলজ্বলে নীল চোখ ঢেকে
সবুজের ইঙ্গিত চিনি —
পরাজিত কামনারা ফিরে আসে
মৃদু পায়ে ;
আবছায়ে
তাদের বিরতি মেপে সময়ের দণ্ড-পল গুণি।

আমার ঘরে ভ্রমর এল

পঙ্কজকুমার বসু
দ্বিতীয় বর্ষ : সাহিত্য

কাজল-
কালো
চোখে
দু'টি
হরিণের
গতি—

জাফরানী
রঙের
বেনারসী
স্বপ্নিল
মায়ায়
শরীরে—

আমার
বুকের বাঁ পাশে
হৃদয়টা

আজ তাই-ই একদল লোকের হাতে প্রিভিলেজের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার রূপ পাল্টে গিয়েছে, তখন পুরোনো আদর্শবোধ ও রীতিনীতি আর সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না।

তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সামনে সমাজের প্রয়োজনে নূতন আদর্শবোধ, নূতন 'সেন্স অব্ ভ্যালুজ্' গড়ে তোলা দরকার; এবং এই নূতন সেন্স অব্ ভ্যালুজ্ বর্তমান যুগে স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'তে বাধ্য। সারা দেশের ছাত্রসমাজের সামনে জীবনের এই নূতন আদর্শবোধ যতদিন না তুলে ধরা যাবে ততদিন ছাত্রসমাজকে হাজার গালাগাল দিলেও কোন কাজ হবে না। এ কথা কত সত্য বাস্তব অবস্থাই তার প্রমাণ। ছাত্রসমাজের বিভিন্ন আচরণকে যতই নিন্দা করা হচ্ছে ততই তা বাড়ছে। পরীক্ষার হলে তত বেশী ঘন ঘন চেয়ার-টেবিল ভাঙছে। অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা পাশ করার ঝোঁক সংক্রামক ব্যাধির মতো বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শিক্ষার জগৎকে কলুষিত করছে। মূলতঃ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কল্যাণে জীবনের প্রতিটি স্তর আজ অনিশ্চয়তা, অব্যবস্থা, স্বার্থপরতা, দুর্নীতির পঙ্কিল বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। ছাত্রসমাজও এর থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য এককালে ছিল জ্ঞানার্জন, আজ তা দাঁড়িয়েছে কেবল মাত্র অর্থার্জন। মানুষ বহুযুগের জীবনসংগ্রামের পথে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ গড়ে তুলেছে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য যে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সে কথা আজ আর কেউ ভাবেও না, আর যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে অনুসৃত হয় তাতে ছাত্রদের এ ভাবে ভাবানোও হয় না। যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য আখের গোছানো, সেখানে সার্টিফিকেটটাই বড় কথা হয়ে দেখা দিয়েছে। নূতন সেন্স অব্ ভ্যালুজ্ সৃষ্টি করে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যদ্বারা ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করে সর্বস্তরের ছাত্রদের মধ্যে চেতনা গড়ে তোলাই এ সমস্যা সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী উপায়।

আপাততঃ যাতে পরীক্ষার হলে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র কঠিন ও সিলেবাস-বহির্ভূত বলে যে সব অভিযোগ উঠেছে তা ক্ষেত্রবিশেষে সত্যি বলেই মনে হয়। এর কারণ, এমন সব ব্যক্তির হাতে প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় যাঁদের বর্তমান শিক্ষাজগৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। ফলে, এমন সব বিষয়ের উপরও প্রশ্ন হয় যার সঙ্গে ছাত্ররা একেবারেই পরিচিত নয়। অবিলম্বে এ পদ্ধতি বন্ধ হওয়া দরকার। সিলেবাস্ নির্ধারণও শিক্ষক-অধ্যাপকদের পরামর্শের ভিত্তিতেই করা উচিত। শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরাই শেষ কথা বলবার অধিকারী হ'তে পারেন না।

অবশেষে, ছাত্রসমাজকেও এ কথা বুঝতে হবে যে শিক্ষা বা ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবীতে ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা এক জিনিস নয়। ছাত্রদের পরীক্ষাকেন্দ্রে

কিছু একটা হবে।
নিজের দেওয়ালে, হলুদ দেওয়ালটাতে
মাথা ঠুকি ঠকাঠক্—প্রাণের মর্ম চিরে
বয়ে যায় জলন্ত অঙ্গার।

সময়ের সুড়ঙ্গ বয়ে চলে যাই
অদৃশ্য পিঁপড়ের ক্ষিপ্রগতিতে, কিংবা
বাসের জানালার ফাঁকে বহুদিনের
এষণার সেই মুখটিকে খুঁজে পেয়ে
আমার চোখে সাপ করে কিলবিল।

চৌরঙ্গীর ফুটপাথে ঘুমিয়ে থাকে তখন
অর্ধশতাব্দীর যাযাবর—
আকাশের বাঁকা পথে রাঙা হয়ে একটু পরে
হয়তো উঠবে রক্তসূর্য।

ঝরনারা কথা বলে

জয়ন্ত ঘোষ

তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

কী ভীষণ ভালোবাসায় ঝরনারা কথা বলে!
চপলা কুমারীর মতো পা ফেলে ফেলে তারা
ধীরে ধীরে নেমে যায়
বিদিশায়, কোণারকে, ইলোরার অজন্তার
সমস্ত ছবি গুহা মন্দিরে।
কী ভীষণ ভালোবাসায় ঝরনারা কথা বলে!
ছোটো ছোটো নুড়ি সূর্যের সাত রং চুরি করে
হেসে ওঠে, মনে পড়ে দেবযানী শর্মিষ্ঠার মুখ।

ভূতত্ত্বের সন্ধানে

ভূতত্ত্ব বিভাগের জনৈক ছাত্র

অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনটা চলেছে। কামরার ভেতরে আমরা। রথীন, জগন্ময়—ওরা এক কোণে তাস খেলছে, এদিকে দরজার সামনে অমিত, ভীষ্ম, আশিস্—আমরা কয়েকজন জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি। বাকি সবাই ঘুমোচ্ছে। আমাদের সবার দায়িত্ব নিয়ে অধ্যাপক শ্রীঅজয়কুমার সেন চলেছেন। উনি উঠে ব'সে বললেন, 'এবার উঠে পড় সবাই, যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমরা এসে গেছি।'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। গাড়ি থামল এসে 'আসানসোল' স্টেশনে। তখন ভোর চারটে। সেখানে নেমে খানিকটা হেঁটে 'মাইথন ড্যাম'-এ যাবার বাস্ ধরলাম।

সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ গন্তব্য স্থানে এসে পৌছুলাম। জায়গাটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এক নিমেষেই। ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মত দৃশ্য। দূরে মাইথন বাঁধ। গেরিমাটি রঙ-এর বাঁধের নিয়ন্ত্রিত জলধারা শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে নাচতে নাচতে চলেছে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্ত পাথর আর ছোট-বড় বাদামী রং-এর পাহাড়।

আমাদের থাকবার জন্য দু'টো বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল—একটি 'বিশ্রাম কুটির', অপরটি 'শান্তি নিবাস'। বিশ্রাম কিন্তু বেশী হয় নি। প্রথম দিন পৌছেই সকালের খাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

বাজনা কোলফিল্ডে কয়লার খনি দেখতে এসেছি। সেখানে কোলিয়ারিতে মিঃ উপাধ্যায় আমাদের সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন। অধ্যাপক অজয়বাবুও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এক জায়গায় বেঞ্চ পদ্ধতিতে সরাসরি মাটির উপর থেকে কয়লা খুঁড়তে দেখলাম। খনি থেকে ওয়াগন বোঝাই কয়লা উঠে আসছে। সব দেখতে দেখতে একসময়ে খনিতে নামলাম। পাথুরে দেওয়ালে গুঁতো লাগতে পারে তাই মাথায় হেলমেট পরে নিলাম। তাতে টর্চের মত আলো লাগানো আছে। সেই আলোয় পথ চলতে লাগলাম। গুহার মত পথ, চারপাশে কালো অন্ধকার। নীচে নামতে পায়ের নীচে জল ছপাৎ ছপাৎ করতে লাগল। মাটির স্তর চুঁইয়ে জল এসে জমছে। পাম্প্ করে সে জল উপরে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। গাঁইতির আঘাতের গুম্ গুম্ শব্দ দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। কালো ঝামার মাঝে মাঝে কালো কয়লার স্তর

খাদ্যে, ওষুধে, এমন কি তোমার-আমার
প্রেমেও ভেজাল।
সৃষ্টিকর্তা যে সুন্দরের সৃষ্টি করেছিলেন
মহানন্দে, এবার তিনি প্রলয় নৃত্যে
এই কীটদষ্ট সুন্দরকে
ধ্বংস করবেন।

ধ্বংসের পর
আবার নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হবে,
সেদিন তুমি আমি
নতুন করে গৃহ রচনা করব,
ভবিষ্যতের নতুন সূর্য ওঠার কথা
মনে রেখে।
এখন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

বিচিত্রা

সুশীলকুমার বশিষ্ঠ
তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

দূর থেকে দেখা গেলে যেখানেই থাক
যেন কোনো আশঙ্কায় ঘরে দেয় ছুট,
বালিশের তুলাস্তূপে গোঁজে তার নাক
মরুতে আসন্ন ঝড়ে কম্পমান উট।

চলে গেলে পথ বেয়ে চোখ মেলে থাকে,
সবুজ তৃণের দিকে ক্ষুধিত জিরাফ।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

পবিত্রকান্তি দে সরকার

দ্বিতীয় বর্ষ : বিজ্ঞান

সারা দুনিয়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করে চলেছে অপরাজেয় ভিয়েৎনাম। সামান্যতম সমরোপকরণ আর মামুলী ধরনের কিছু অস্ত্রশস্ত্র, যার অধিকাংশই শত্রুসৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া—এই নিয়েই ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা-সংগ্রামী জনসাধারণ আর দক্ষিণ ভিয়েৎনাম মুক্তিফৌজ আজ পৃথিবীর বৃহত্তম বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর অধিকারী, সর্বপ্রকার আধুনিকতম মারণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিকে একটার পর একটা লড়াইয়ে পর্যুদস্ত করে কোণঠাসা করতে করতে আজ সমুদ্রের কিনারে ঠেলে নিয়ে এসে ফেলেছে। সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও এই স্বাধীনতা-সংগ্রামী জনগণকে জানাই আমাদের অভিনন্দন।

ভিয়েৎনামের মাটিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আজ আর পা রাখবার জায়গা নেই। মুক্তিফৌজ দখল করেছে অর্ধেক সায়গন—১৩টি প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্টের সরকার। উত্তরের বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি দানাংও মুক্তিফৌজের দখলে। মাত্র কয়েকটি উপকূলবর্তী শহর ও সায়গন ছাড়া সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন বাহিনী সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিনী নৌবহর থেকে আজ সে দক্ষিণ ও উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে চলেছে। মুক্তি-ফৌজের এই সাফল্যে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে মার্কিনের অনুগামী তথাকথিত 'মিত্র রাষ্ট্রে'র দল। তারা ঘোষণা করেছে—ভিয়েৎনামে আর সৈন্য পাঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই দুঃসময়ে একমাত্র চিয়াং কাইশেক ছাড়া আর কোন মিত্রই মার্কিনের নেই। কেউ কেউ যদিও মৌখিক সমর্থন জানিয়েছে, তবু এই সমস্ত দেশের জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ বছর জেনেভা চুক্তির ১৩শতম বার্ষিকী উপলক্ষে ভিয়েৎনাম সংহতি সপ্তাহে সারা পৃথিবীর দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিকামী জনসাধারণ ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা-সংগ্রামী জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভ ধ্বনিত করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ সারা দুনিয়া থেকে আজ বিচ্ছিন্ন হ'তে চলেছে।

পথে বেরিয়ে দেখলাম—
প্রায় চারিদিকেই অন্ধকার,
সেখানকার মানুষগুলোকে আর চেনাই যায় না!
তবে মাঝে মাঝে চোখ-ধাঁধানো আলোয়
সোনার রথে চড়া
কিছু দেবদূতকে দেখা গেল।
আমার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

তাই, আমি এখন
ওদেরই একজন—
যারা সমাজের সব মাথাকে এক করে দিতে চায়।

"প্রাণতত্ত্বের বিবর্তন হতে যেমন হয়েছে মনের উদ্ভব, তেমনি মনের বিবর্তনের শেষ সীমায় মানুষের দেহে উদ্বুদ্ধ হবে অতিমানস সত্তা। সেই অতিমানুষ সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশেই মানুষ লাভ করবে পূর্ণতার স্বাদ।"

—শ্রীঅরবিন্দ

আমরা এ কথা বলছি না যে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন আজই সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুক। তার আর প্রয়োজনও নেই, কারণ ভিয়েৎনাম-বাসীরাই আজ নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু কমিউনিস্টপন্থী দেশগুলি এই যুদ্ধের পরিপূরক হিসাবে সামরিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে অবশ্যই পারে। চীনও প্রতিবেশী রাষ্ট্র। মুখে হম্বিতম্বি করলেও সেও এ যুদ্ধে ভিয়েৎনামকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে একেবারেই এগিয়ে আসে নি। অথচ ওরাই নিজেদের সাচ্চা কমিউনিস্ট বলে দাবী করে! আর আমরা, আমরা ভারতবাসীরাই কি কিছু করতে পেরেছি?

পাই

মিলনকান্তি দাশ

প্রথম বর্ষ : বিজ্ঞান

বলছিলাম 'পাই'এর কথা। না, না,—আমি পুরানো পয়সা, পাই পয়সা সম্বন্ধে আলোচনা করছি না। বলছি অঙ্কশাস্ত্রের 'পাই' নামক ধ্রুবকের (constant) সম্বন্ধে।

এর জন্মকাল কবে আর এর আবিষ্কারকর্তাই বা কে তা আজও সঠিক জানা যায় নি। তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক অংশ এই ধ্রুবকটি অনেক কাল আগে থেকেই অলংকৃত করে আছে।

বর্তমানে π এই চিহ্নটির দ্বারা সংক্ষেপে এই ধ্রুবকটিকে বোঝান হয়। পূর্বে p এবং C দ্বারাও এটাকে বোঝান হ'ত। তা ছাড়া এর সংজ্ঞা নানাভাবে দেওয়া যায়। তবে সংজ্ঞা যে ভাবেই দেওয়া হোক না কেন, এর মানকে কিন্তু সর্বদাই ধ্রুবক ধরা হয়। হ্যাঁ, আরও একটি কথা, এই ধ্রুবকের কোন একক (Unit) নেই।

এবার 'পাই'এর ইতিহাস নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। নীলনদের সভ্যতা ও ব্যবিলনীয় সভ্যতার যুগে সেখানকার স্থপতিরা তাঁদের স্থাপত্যনির্মাণে যে 'পাই'কে প্রয়োগ করতেন তার নিদর্শন বহুস্থানে পাওয়া যায়। তাঁরা এর মান $3\frac{1}{8}$ বা ৩·১৬০৫ ধরে কাজ করতেন। ইউক্লিডের তথ্য থেকেও জানা যায় π এর মান ৩ এবং ৪ এর মধ্যে।

আর্কিমিডিস জ্যামিতির সূত্র ধরে, একটি বৃত্তে ৯৬ বাহু বিশিষ্ট অন্তর্লিখিত (Inscribed) এবং বহিঃলিখিত (Circumscribed) দু'টি বহুভুজ এঁকে দেখিয়ে ছিলেন যে,

কাণ্ড ও পত্রপুষ্পাদির রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ঐ সব উদ্ভিদের মধ্যে বহুল পরিমাণে ইউরেনিয়ম নামক তেজস্ক্রিয় ভারী ধাতু আছে। তিনি আরও বলেন যে সেখানকার মাটিতে পেগমাটাইট নামক পাথরে এই ইউরেনিয়ম ধাতু পাওয়া যায়।

তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে উড়িষ্যার কেওনঝার জেলার বরবিল নামক স্থানের লৌহ ও ম্যাংগানিজ আকরের উপর অবস্থিত উদ্ভিদের বাড়ন্ত খুব বেশী এবং পত্রাদির রংও গাঢ় সবুজ বর্ণ। তিনি ঐ উদ্ভিদের অংশ নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে লৌহ ও ম্যাংগানিজ আছে।

গবেষকগণ যদি উদ্ভিদের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থের সন্ধান করতে সক্ষম হন তা হলে খনিজ দ্রব্যের সন্ধানের জন্য আর আয়াসসাধ্য ও ব্যয়বহুল ড্রিলিং পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে না।

মহাজীবন, মহামরণ

শশাঙ্কশেখর ঘোষ
প্রথম বর্ষ : সাহিত্য

মার্টিন লুথার কিং আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে এত বড় মর্মান্তিক ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। যে বিরাট কর্মবীরের মুখ চেয়ে কোটি কোটি নিপীড়িত নরনারী ভবিষ্যতের এক রঙিন স্বপ্ন দেখছিল মাত্র ৩৯ বছরেই সেই বিরাট পুরুষের জীবনে নেমে এল মৃত্যুর যবনিকা।

কিং ছিলেন নিগ্রোজাতির নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। পুরো নাম রেভারেণ্ড ডঃ মার্টিন লুথার কিং। ১৯২৯ সনের ১৫ই জানুআরি আটলানটায় তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন এনেজার ব্যাপ্‌টিস্ট্‌ চার্চের একজন ধর্মযাজক এবং মা ছিলেন একজন শিক্ষয়িত্রী। তাঁর অপর নাম ছিল মাইকেল।

মার্টিন লুথার কিং-এর লেখাপড়ার আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না। ১৫ বছর বয়সে বুকার টি ওয়াশিংটন হাই স্কুলে পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতা তাঁকে আটলানটার মোরহাউজ্‌ কলেজে পাঠালেন। ১৯৪৮ সনে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি স্নাতক হয়ে বের হলেন এবং পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার চেষ্টার-এর ক্রোজার থিয়লজিক্যাল সেমিন্যারি-তে যোগদান করলেন। ১৯৫১ সনে লাভ করলেন বি. ডি. ডিগ্রী। এর পর ১৯৫৫ সনে সিস্টেম্যাটিক্ থিয়লজি সম্বন্ধে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে হার্ভাড্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি-এইচ্‌. ডি. ডিগ্রীতে ভূষিত হলেন। এ ছাড়া মেধাবী

বা

$$\pi = \frac{৩৫৫}{১১৩}।$$

পিসা শহরের লিওনার্ডোর মতে

$$\pi = \frac{১৪৪০}{৪৫৮\frac{১}{২}} = ৩\cdot১৪১৮$$

এবং ভিয়েতার মতে

$$৩১৪১৫৯২৬৫৩৪ \times ১০^{-১০} < \pi < ৩১৪১৫৯২৬৫৩৭ \times ১০^{-১০}$$

এর পর আসা যাক অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে। উইলিব্রর্ড স্নেল

$$\frac{3\sin\theta}{2+\cos\theta} < \theta < \left(2\sin\frac{\theta}{3} + \tan\frac{\theta}{3}\right)$$

এই উন্নত সূত্রের সাহায্যে π-এর মান নির্ণয় করেন। সমসাময়িক গণিতবিদ্ জেমস গ্রেগরী

$$\theta = \tan\theta - \frac{1}{3}\tan^3\theta + \frac{1}{5}\tan^5\theta + \cdots,$$

মাসিন
$$\frac{\pi}{4} = 4\tan^{-1}\frac{1}{5} - \tan^{-1}\frac{1}{239},$$

১৭৭৬ সালে হাটন

$$\frac{\pi}{4} = 5\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}$$

এবং ১৭৭৯ সালে অয়লার

$$\frac{\pi}{4} = 5\tan^{-1}\frac{1}{7} + 2\tan^{-1}\frac{3}{79}$$

সূত্র ধরে π-এর মান নির্ণয় করতে সক্ষম হন।

এর পর উনবিংশ শতকের কথা।

১৮৪১ সালে রাদারফোর্ড

$$\frac{\pi}{4} = 4\tan^{-1}\frac{1}{5} - \tan^{-1}\frac{1}{70} + \tan^{-1}\frac{1}{99}$$

সূত্রের সাহায্যে ২০৮ দশমিক স্থান পর্যন্ত এবং ১৮৫৩ সালে ৪৪০ দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান বের করেন। তাঁর অনুকরণে উইলিয়াম শ্যাঙ্কস ৫২৭ দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান বের করেন। রিখটার ১৮৫৩ সালে ৩৩০ দশমিক স্থান পর্যন্ত, ১৮৫৪

আততায়ীর অতর্কিত গুলিতে উনচল্লিশ বছর বয়সে অহিংসার পূজারী রেভারেণ্ড ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যু হয়।

ডঃ কিং-এর আদর্শ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণকায়দের সমান অধিকার প্রদান। কিন্তু অন্ধ বর্ণবিদ্বেষ—অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা তাঁর সেই মহান্ আদর্শবাদকে হীন অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শতম প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৫ সনে, বিংশতিতম প্রেসিডেণ্ট জেমস্ গারফিল্ড্ ১৮৮১ সনে, পঞ্চবিংশতিতম প্রেসিডেণ্ট উইলিয়ম্ ম্যাক্‌কিন্‌লি ১৯০১ সনে এবং পঞ্চত্রিংশত্তম প্রেসিডেণ্ট জন ফিট্‌জারেলড্ কেনেডি ১৯৬৩ সনে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। এঁদের সকলেরই আদর্শ ছিল নিগ্রো নাগরিকদের সমান অধিকার স্বীকার করা।

ডঃ কিং ছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষ্য। তিনি বলেছিলেন, "From my Christian background I gained my ideals and from Mahatma Gandhi I gained my operational technique."

রেভারেণ্ড ডঃ মার্টিন লুথার কিং আজ লোকান্তরিত হলেও ইতিহাসের পাতায় তিনি চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। আফ্রিকা-আমেরিকার কোটি কোটি নির্যাতিত কালো মানুষের মুক্তিসংগ্রামে তিনি বেঁচে থাকবেন। একটি বহুপ্রচলিত ইংরেজি বাক্যকে সামান্য পরিবর্তন করে আমরা বলতে পারি, "King is dead, long live King."

এ কিং কোন্ দেশ বিশেষের রাজা ন'ন—জগতের কোটি কোটি নিপীড়িত জনগণের হৃদয়ের রাজা।

ডাল্টনগঞ্জ ঘুরে এলাম

তরুণকুমার ঘোষাল
তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

১৯৬৬ সালের বিজয়া দশমীর দিন। পূজোর দিন ক'টা আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে রাত্রি ৮-৩০ মিনিট নাগাদ আমরা তল্পিতল্পা সহ জমায়েত হলাম হাওড়া স্টেশনে, উদ্দেশ্য ডাল্টনগঞ্জের পথে পাড়ি দেওয়া। আমরা সব সমেত ছিলাম জন পঞ্চাশের একটি দল। অভিভাবক হিসেবে ছিলেন আমাদের দু'জন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত। এটি আমাদের প্রতিবারের মত ভূগোল পরিষদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ। এবার আমরা বেছে নিয়েছিলাম ডাল্টনগঞ্জকে।

যথা সময়ে জনতা উইক্‌লি এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করল এবং নানা জায়গায় থামতে

নাতিপ্রশস্ত রূপকার-কক্ষে মুখোমুখি বসেছিলাম দু'জনে। যাঁরা শ্রী দত্তের সঙ্গে সামান্যমাত্র পরিচিত তাঁরা সকলেই জানেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এবং চলচ্চিত্রে এ রকম অমায়িক এবং উদার শিল্পী খুব কমই আছেন। আমি প্রশ্ন করলাম :

—আপনি কত সালে আমাদের কলেজের ছাত্র ছিলেন ?

—আমি ১৯৪০-৪১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ঐ মাসেই আশুতোষ কলেজে ভর্তি হই ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে।

—তখন কে প্রিন্সিপাল এবং ভাইস্-প্রিন্সিপাল ছিলেন ?

—মাননীয় পঞ্চানন সিংহ মশাই ছিলেন প্রিন্সিপাল আর সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় মশাই ছিলেন ভাইস-প্রিন্সিপাল।

—আচ্ছা, তখন কি কলেজে উৎসব উপলক্ষে নাটক অভিনয় হ'ত ? আপনি কি তাতে অংশ গ্রহণ করতেন ?

—হ্যাঁ, তখন নানা নাটক হ'ত, কিন্তু আমি তখন অভিনয় শুরু করি নি।

—আপনি কত সালে প্রথম অভিনয় শুরু করেন এবং কোন্ সংস্থায় ?

—১৯৪৮ সালে বহুরূপী গোষ্ঠীতে আমি যোগ দিই। সেখানে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত অভিনয় করি। তারপর আনন্দম্, এবং সেই আনন্দমের বর্তমান রূপ রূপকারে যোগ দিই ১৯৫৫ সালে। এখন আমি রূপকারের একজন শিল্পী।

—আপনি কতদিন অভিনয় করবেন ?

—যতদিন বেঁচে থাকব এবং করতে পারব।

—আপনি অভিনয় কেন করেন ?

—অভিনয়কে ভালবাসি বলে।

—আচ্ছা, নাট্যাভিনয়ে আঙ্গিক এবং অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌টাকে আপনি বেশী প্রাধান্য দেন ?

—আমার মতে দুটোকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। একটা অপরটার পরিপূরক। তবে অভিনয়কে বাস্তবানুগ করতে হলে আঙ্গিককে প্রাধান্য দিতে হবে।

—বর্তমানে দেখছি, আপনি রোম্যান্টিক নায়কের ভূমিকায় অভিনয় না করে কৃষ্টি-সংস্কৃতিমূলক নাটকে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন—কারণটা কি ?

—কৃষ্টি-সংস্কৃতিমূলক বলতে আপনি কি বলতে চান জানি না, তবে চারণ কবি মুকুন্দদাস, এন্টনী কবিয়াল এইসব নাটকের চরিত্রগুলো আমাদের দেশে জীবন্ত ছিল। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাঁদের দান অনস্বীকার্য। তাঁদের দান সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্যক্‌ভাবে জানাবার জন্য ঐ সব চরিত্রে রূপ দিতে আমার ভালো লাগে। এ ছাড়া আমি বহু অভিনয় করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব। তবে যে চরিত্রে বলার কিছু আছে সেই চরিত্রেই আমি রূপ দিই।

অবসর সময়ে আমরা ঐ মাঠে একটুআধটু খেলতামও। শুধু স্কুলটাই নয়, ডাল্টনগঞ্জ শহরটাও মোটামুটি সাজানো-গোছানো। মাঝারি আকারের শহর। এক পাশে বয়ে যাচ্ছে কোয়েল নদী। কতকগুলো মিষ্টি সন্ধ্যে কাটিয়েছি আমরা অনেকে সেই নদীর পাড়ে। সে সন্ধ্যেগুলো জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না।

মাঝখানে একদিন ঘুরে এলাম পালামৌ রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে,—যেখানে হিংস্র শ্বাপদেরা উন্মুক্ত পরিবেশে অথচ রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে দিয়েই বেড়ে উঠছে। এ রকম জঙ্গলকে 'শ্যাংচুয়েরী'ও বলে। জঙ্গলের কাছেই দু'টো পুরোনো ফোর্ট অর্থাৎ কেল্লা দেখলাম। একটি স্থানীয় এক রাজার এবং আর একটি ইংরেজদের। সেই অর্ধভগ্ন দু'টি কেল্লা পুরোনো দিনের ইতিহাস বহন করে নিয়ে চলেছে। একটি দুর্গে একটি বিরাট কুয়ো চোখে পড়ল। কিংবদন্তী—এই কুয়োয় নাকি শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষকে ফেলে দেওয়া হ'ত। নীচে জল থাকত না, থাকত কয়েকটি বুভুক্ষু সিংহ। কাজেই হতভাগ্য মানুষটির আর কোন কালেই ফেরা সম্ভব হ'ত না। শেষ পর্যন্ত নাকি রাজা ও রানী দু'জনেই সেই কুয়োর পড়ে আত্মহত্যা করেন।

আমাদের সমস্ত কাজকর্ম ছিল ডাল্টনগঞ্জকে ঘিরে। তাই কাজ যেদিন ফুরোল সেদিন আমাদের ডাল্টনগঞ্জ ছাড়ার সময়ও ঘনিয়ে এল। কিন্তু আমাদের হাতে তখনও দিন দুয়েক সময় ছিল, তাই ঠিক করলাম রাঁচিটাও ঘুরে আসব। নির্দিষ্ট দিনে আমরা কাকপক্ষী জাগার পূর্বেই রাঁচির বাসে চেপে বসলাম এবং সম্ভবতঃ কেউ টের পাবার আগে ডাল্টনগঞ্জ ত্যাগ করলাম।

বাস্ চলছে, ডাল্টনগঞ্জও হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ হৃদয়ে কেমন একটা বেদনা অনুভব করলাম। এই স্বল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ডাল্টনগঞ্জ কি এক অদৃশ্য মায়াজালে আমাদের বেঁধে ফেলেছিল।

বাস্ এগিয়ে চলছে, মনে পড়ছে কোয়েল নদীর তীরের শান্ত সন্ধ্যাগুলো, প্রখর রৌদ্রে সহৃদয় কৃষকের পানীয় জলদান; বিশেষ করে মনে পড়ছে সেই হল্ ঘরটার কথা, যেখানে আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতাম। ভুলতে পারব না অধ্যাপকদের সেই আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বমূলক ব্যবহার। ভুলতে পারব না সে দৃশ্য—ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় বিদ্যুৎবাবু (আমাদের ভাষায় বি. বি.) আমাদের চাদর টেনে ফেলে দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে ডাল্টনগঞ্জ এক মধুর স্মৃতিতে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। মনে মনে বললাম, বিদায়—ডাল্টনগঞ্জ,—বিদায়! যদি কোনদিন সম্ভব হয় আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।

বাস্ এগিয়ে চলল দু'পাশে ঘন বনানীর মধ্যে দিয়ে—আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে হেলতে দুলতে।

শিলাবৃষ্টি

সুব্রত ভদ্র

প্রাক্তন ছাত্র

। এক ।

বনানী ভাবছিলো……।

……

জয়ন্তর সঙ্গে কতোদিন দেখা নেই !

অথচ জয়ন্তটাও যেন কী ! বনানী কেমন আছে, একটা চিঠি দিয়ে তার খোঁজ নেবারও কি দরকার নেই ?

বনানী অবশ্য বার তিনেক ওর মেসের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলো। উত্তর আসেনি।

। দুই ।

একটা স্কুলে সম্প্রতি একটা শিক্ষিকার কাজ পেয়েছে বনানী।

মাইনে আড়াইশো।

অবশ্য বাবা যা রেখে গিয়েছেন তা দিয়ে বনানী সারা জীবন স্ফূর্তি করতে পারে। তবুও বনানীর পড়াতে ভালো লাগে।

এম. এ.-তে সেকেণ্ড ক্লাসে বেশ ওপরের দিকেই হয়েছিল ও বাংলায়।

জয়ন্তকে নিয়ে বাঁচবার একটা ভারি সুন্দর স্বপ্ন তৈরী করেছে ও।

। তিন ।

স্কুলের সেক্রেটারী, রামগোপালবাবু। সারা গা ভর্তি লোম।

ছোট্ট শরীর। হোঁৎকা গড়ন। ব্যাচেলার।

ওঁর চোখের ভাষা বনানী বোঝে।

লোকটা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো, আপনি কি বিবাহিত ?

জিজ্ঞেস করার কী ছিরি ! আর কি কথা পেলো না লোকটা !

—না। —ছোট্ট উত্তর বনানীর।

—সাহিত্য দেবীর অলৌকিক সৃষ্টিশক্তির আর এক রূপ। সাহিত্য ভারতী। সাহিত্য বেদের শ্রুতি, তন্ত্রের নির্দেশ। সাহিত্য দিব্যজ্যোতিঃ—নিরাকার ব্রহ্মের আরাধনায় শঙ্খধ্বনির মঙ্গলারতির মধ্যে দিয়ে তাকে বরণ করতে হয়। আর কত বলব, যতই চোখে অলস কল্পনার রঙ্গিন চশমা পরে এ বর্ণনা ফেনানোর চেষ্টা করব ততই ফাঁপস ফাঁপবে; কিন্তু যুক্তি, তর্ক ও চেতনার দ্বারা সাহিত্যবিচারের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়াই সার হবে, কিছু কাজ হবে না।

অলস মধ্যাহ্নে ঢুলু ঢুলু চোখে নিয়ত স্বপ্নের মধুযামিনী-সৃষ্টিরত সেই সব সাহিত্যের তত্ত্বকারদের নিকট আমার প্রশ্ন, তাঁদের এইসব বাস্তববর্জিত তত্ত্বের ডালি মেলে দিয়ে সাধারণ মানুষের, যাদের কাছে অলীক স্বপ্নের রাজ্য কল্পনার অমরাবতীর সমান, সামনে তাঁরা কি দৃষ্টান্ত রাখতে চান? সহস্র সহস্র খেটে-খাওয়া জনতার না-বলা কথাকে যদি তাঁরা অন্ততঃ একটু কলমের আঁচড়ে ফোটাতেও না পারে, তাঁরা কি ধরনের চিরন্তন শাশ্বত সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস করেন? যেখানে চিরন্তন, শাশ্বত, শিব, নিরাকার, ভাবলোক প্রভৃতি আভিধানিক শব্দগুলো শুধু কথা মাত্রই সার, যার সম্বন্ধে বেশীর ভাগ সাহিত্যিকদের ধারণাশক্তি অস্পষ্ট, যাকে একটা নির্দিষ্ট ভাবে, যথার্থ ভাবে চিন্তা করা যায় না, চিন্তা করতে হয় বিচ্ছিন্ন ভাবে, হাজার হাজার ধূলায় লুণ্ঠিত মানুষের আবাস, সমাজ থেকে অনেক দূরের পথের যাত্রীরূপে কল্পনা করে। সাহিত্য শাশ্বত, রূপময়, সঙ্গীতময়! ভাল কথা। শাশ্বত যদি হ'লই, তবে কি শাশ্বত, কেন শাশ্বত তা বিচার করাও আমাদের প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন, এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তুজগতে কোনও চিরন্তন পদার্থ কিংবা ভাবলোকের অবস্থান সম্ভব কিনা তার বিচার করা। তথাকথিত সাহিত্যের ভাষ্যকারদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাঁরা অন্ততঃ এটুকু মানেন কিনা যে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিবর্তন হয়। কাল, যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে কোনও অ্যাবসলিউট তত্ত্ব খাড়া করা যায় কিনা তাও তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন। প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জীব প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে; একটা জিনিস ভাঙ্গছে, আবার একটা জিনিস গড়ছে। এই হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ম, বিবর্তনের নিয়ম। মানুষেরই তো কত রূপান্তর—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য! অতএব সমাজ, যে সমাজের প্রধান উপাদান মানুষ—সেই সমাজ কি কখনও এক জায়গায়, একটি বিশিষ্ট রূপে স্থির হয়ে, স্ট্যাগ্‌ন্যান্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? পারে না। যদি পারত, তবে সভ্যতার বিকাশ হ'ত সুদূরপরাহত। বস্তুচেতন বিবর্তনই একমাত্র সত্য।

সাম্প্রতিক আধুনিক সভ্যতার পাদপ্রদীপের তলায় বসে অবশ্য বেশীর ভাগ লোক তা প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতে পারেন না, যদিও তাঁরা তাদের ফাঁপা ভাবনার খোরাক হিসাবে সাহিত্যের সংজ্ঞা দিচ্ছেন নিজের মত অন্যরূপে, অন্যভাবে—কিন্তু মূল

অসমাপ্ত টেলিফোন

মনটু পাল

তৃতীয় বর্ষ : বিজ্ঞান

মা-ই ছিলো তার কাছে সব—তার ভালোবাসা, তার চিন্তা, তার জীবন। বাবাকে তো দু'বছর বয়সেই সে হারিয়েছে। এখন আর কিছু নেই। সব ফাঁকা। শূন্য ঘরের দিকে তাকালে তার শূন্য হৃদয়টা মা'র স্মৃতিসাগরে ডুবে যায়। বসন্তের প্রারম্ভ, শীতের শেষ, কুয়াশার সামান্য রেশ মনের ফাঁকা জায়গাটায় ধাক্কা দিয়ে বার বার 'মা' 'মা' ক'রে কেঁদে যাচ্ছে। কোটিয়ার জীবনের তেইশতম বসন্তের প্রথমে এই নির্মম আঘাতে দেহলতা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে সে।

অর্থের অভাব? না, সে দিক্ দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু……

ভবিষ্যতের দিকে কোটিয়া আর তাকাতে পারছে না। এই সীমাহীন শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকা কি সম্ভব?—'না—না আমি বাঁচবো না!'—চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো কোটিয়া।

লেনিনগ্রাদের আর একটা সোনা-ঝরা সকাল। ফোলা ফোলা চোখ দু'টো নিয়ে গতকালের সকালটার সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করে কোটিয়া। ঠিক কালকের মতই আকাশটা আবার মেঘের কালো কালো চুলে ছেয়ে গেল। আকাশটার গায়ে কে যেন ছাই ছুঁড়ে দিয়েছে। সে জানে এ মেঘে বৃষ্টি হবে না—হ'লে যে তার দুঃখ ধুয়ে-মুছে যাবে! নিষ্ঠুর প্রকৃতির তা ইচ্ছে নয়।

* * *

ফিজিক্স্-এর একটা দুরূহ বিষয় নিয়ে রিসার্চ্ করছে কোটিয়া—'ফ্র্যাক্শনাল অরবিটাল্ বম্বার্ডমেণ্ট সিস্টেম্'। এতদিনের সাধনা তার হারিয়ে যেতে বসেছে। সমস্ত যন্ত্রদানবগুলো যেন তার উপর চেপে বসতে চাইছে।

তার সহকর্মী ইগোর কনস্ট্যানটিনোভিচ্ সেদিন ছুটে এলো আনন্দে লাফাতে লাফাতে—"মিস্ কোটিয়া, মিস্ কোটিয়া, আপনার প্রিজাম্শন্ ভীষণভাবে নির্ভুল। আল্ট্রাভায়োলেট রে-র প্রভাবে রাইডারের কাঁটাটা ঠিক 36·4-এর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। আপনি যে ইন্টেন্সিটির কথা বলেছেন, ঠিক সেই ইন্টেন্সিটিতেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই পারবো আবিষ্কার করতে। সত্যি আপনার অপূর্ব

সমাজের সর্ব অঙ্গে বিষফোঁড়া মারছে, পূতিগন্ধময় ক্ষত সমাজকে ধূসর বন্ধ্যা মরুভূমিতে পরিণত করছে সেখানে কি ধরনের সাহিত্য তাঁরা রচনা করবেন। তাঁরা যদি বিবর্ণ ভাঙাচোরা বাস্তবকে উপেক্ষা করে যান, মেরুদণ্ডহীন সমাজের আসল রূপটাকে যদি তাঁরা ফোটাতে না পারেন তবে সে সাহিত্যের মূল্য কতটুকু? অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, অন্ধকারের আবিল স্রোতে অবগাহন না করে কিছুতেই নাকি আলোকের পথে উত্তরণ সম্ভব নয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার "It is a copy of reality, but of higher reality", যে সমাজটা অনাসৃষ্টির চরমে নেমে গেছে, যেখানে জীবনটা সর্বদাই অনিশ্চিত ও দোদুল্যমান, যেখানে অর্থই সমাজের প্রত্যক্ষ নিয়ন্তা, সেখানে এ ছাড়া আর কি সার্থক সাহিত্য তৈরী হতে পারে? সেই সকল সাহিত্যিকদের কাছে আমার বন্ধুসদৃশ অনুরোধ, তাঁরা প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যার অক্ষবিন্দুটি কি তা আগে আবিষ্কার করুন, তারপর চিন্তা করুন এই রকম নৈরাশ্যবাদী দর্শন,—বৃহত্তর মানুষের কথা তো বাদই দিলাম,—অন্ততঃ শিক্ষিত মানুষকে প্রকৃত সমস্যা সম্বন্ধে কতটা ভাবতে সুযোগ দেবে।

যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য একটা বিশেষ দিকে মোড় নিয়েছে। মাটির মানুষের কথা এখানে লিপিবদ্ধ হচ্ছে বটে, কিন্তু সেখানে আদিম যৌন প্রবৃত্তির নির্লজ্জ অ্যাপ্রোচ্‌টাকেই বড় করে দেখান হচ্ছে। এ কথা যদি ধরেও নেওয়া যায় যে কিছু কিছু সাহিত্যিক এই বিশিষ্ট দিক্‌টাকে বেশ স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস করছেন—যদিও বেশীর ভাগ সাহিত্যিকের ব্যবসায়িক দ্বারকে সুগম করে দিয়েছে এই ধরনের বে-আব্রু সাহিত্যচর্চা,—তবুও বিচার করতে হবে কালের ধোপে তা কতটা টিকবে। আমি এ কথা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে আর্টের বিচারে সুন্দর অসুন্দর বলে কোন জিনিসের অ্যাবসলিউট্ নামকরণের অধিকার কারুর নেই। তবু সেই আর্ট যেন কতকগুলো উদ্‌ভ্রান্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন চিন্তার মালা গাঁথার মত খামখেয়ালিপনায় নিযুক্ত না হয়।

পর্নোগ্রাফীকে সাহিত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করার একটা স্রোত এখন বাংলা সাহিত্যের বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এখানে এর কিছু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন মনে করি। সাহিত্যকে শ্লীল-অশ্লীল বলে বিশেষ কোন নামকরণের সার্থকতা কতটুকু তা আমি বুঝি না—কারণ ওটা হয়তো রিলেটিভ টার্ম, কিন্তু দুঃখ হয় তখন, যখন দেখি এই কিম্ভূতকিমাকার সাহিত্যচর্চা হঠাৎ প্রগতিশীল নাম ধারণ করে অভিজাত মহলে নামটা কায়েম করতে চায়। ধরা যাক্ সমরেশ বসু এবং তাঁর গোষ্ঠীর কথা। এ কথা হয়তো খানিকটা ঠিক যে সমাজ যখন একেবারে তলিয়ে গেছে অবক্ষয়ের অতল গর্ভে, যুবমানসের চিন্তার স্রোতে কিলবিল করছে যখন কতকগুলো সাময়িক তৃপ্তিদায়ক নোংরামি, তখন এঁরা বেশ শক্ত হাতে ট্র্যাডিশন্‌কে ভেঙেছেন—নিছক ভাঁড়ামির

মনে ইগোরের সম্বন্ধে কোন দুর্বলতাই নেই? ভাবলো—ইগোরের কথাই ঠিক, পৃথিবীরও অন্য গ্রহের প্রতি আকর্ষণ আছে। শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠলো। তার শূন্যতা যেন ইগোর ভরিয়ে দিয়ে গেছে। ও তৈরী হয়ে নিলে ইন্‌স্টিটিউটে যাবার জন্য।

রিসার্চ্ ইন্‌স্টিটিউটে পৌছে ইগোর সোজা রাইডারের কাছে চলে যায়। অন্যান্য কর্মীরা জিজ্ঞাসা করে, "মিঃ ইগোর, মিস্ কোটিয়া এলেন না?"

"উনি আসছেন এখনই। ইন্‌টেন্‌সিটিটা আর একটু বাড়িয়ে দেখতে বললেন। রে-র ইন্‌টেন্‌সিটি কত বাড়ালে রাইডারের অ্যাট্রাক্‌শন্‌টা ইন্‌ফিনিটিতে গিয়ে পৌছয় দেখতে বললেন। দয়া করে আপনারা বাইরে গিয়ে ওঁর জন্য অপেক্ষা করুন।"

সবাই রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের বাইরে এসে দাঁড়ায়। মিস্ কোটিয়া যখন বলেছেন তখন সবাই উৎসুক হয়ে পরীক্ষার ফলের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হ—ঠা—ৎ বিকট একটা গগনভেদী শব্দ হয়ে সমস্ত রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটটা ধ্বসে পড়লো। সমস্ত কর্মীরা খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই ছোটাছুটি শুরু করলেন। এক বিরাট আবিষ্কারের সম্ভাবনা মুহূর্তে চূর্ণ ক'রে দিয়ে এক তরুণ বিজ্ঞানীর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

* * *

মিস্ কোটিয়া এসে দাঁড়ালো রিসার্চ্ ইন্‌স্টিটিউটের সামনে—শুনলো—"রে-র ইন্‌টেইন্‌সিটি ক—ত বাড়ালে তবে রাইডারের অ্যাট্রাক্‌শন্‌টা ইন্‌ফিনিটিতে গিয়ে পৌছয় দেখতে হবে"—কথাটা।

মহাশূন্যের দুদিক্ থেকে যেন অদৃশ্য টেলিফোন বেজে উঠলো। মা আর ইগোরের কথা ভেসে আসতে লাগলো যেন!

"তুই চলে আয়, মা!"

"তুমি চলে এসো, কোটি!"

সেও যেন বললো—"হ্যাঁ যাচ্ছি।"

আরও কিছু বলতে চাইলো। আরও কিছু শুনলো কোটিয়া যা ইগোর বলে নি, মা-ও না। কিংবা হয়তো বলেছে, টেলিফোন তা পৌছে দিতে পারে নি।

যন্ত্রণা, বঞ্চনা—এই আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু সেই যন্ত্রণাবোধ থেকে মুক্তিলাভ করার, নতুন সমাজ গড়ার স্পিরিট আমাদের নেই, নেই নতুন কোন মর‍্যালিটিকে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ প্রয়াস, অথবা সংগ্রামী স্পৃহা। সুখ তো দূরের কথা। অর্থ দিয়ে বিকৃত রুচির আনন্দ কেনা—এই মনোবৃত্তিই যেন আমাদের মধ্যে প্রবল। অর্থাৎ বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে ভারসাম্যের একেবারেই অভাব—সমস্ত সমাজটা দাঁড়িয়ে আছে এই ফার্স-এর উপর, অর্থাৎ এই আপেক্ষিক মানসিক বিকারের উপর।

এখন আমাদের দেখবার বিষয়, এই ঘুণধরা শ্রেণীবিভক্ত সামাজিক পরিবেশে আমরা নতুন মর‍্যালিটি—নতুন এথিক্স-কে সামাজিক তথা সাহিত্যিক দর্পণে চিহ্নিত করতে পারি কিনা, এবং সেই নতুন সামাজিক পরিবর্তনে গণমানস ও গণচেতনার রূপকার হিসাবে সাহিত্য কি ভূমিকা পালন করতে পারে। একটা কথা, যারা "Art for Art's sake" নীতির প্রবক্তা, তাদের সঙ্গে আমার পার্থক্য মূলগত। নিছক শিল্পের জন্য শিল্প, অর্থাৎ সাহিত্যিকের খেয়ালখুশিমত যে কোন সাহিত্যচর্চা, তা অস্তিত্বশীল সামাজিক নৈরাজ্যকেই রূপায়িত করুক, কি ভাববাদী অলৌকিক চিন্তাধারাকেই রূপ দিক, সেটা নাকি সাহিত্যিকের দেখার বিষয় নয়। তিনি কেবল গহন অরণ্যে বসে স্বপ্নের রাজ্যে পদচালনা করবেন। আমার সৃষ্টিটা,—সে সমাজকে নৈরাশ্যবাদী বিষণ্ণতার মধ্যে ঠেলে দিক, অথবা মানুষকে দিন দিন ন্যায়নীতির প্রতি অনাস্থাশীল করুক, তা আমার দেখার প্রয়োজন নেই; মোটামুটিভাবে তা তাদের বিচারে রসোত্তীর্ণ হ'লেই হ'ল। আর্টে রসোত্তীর্ণতাকে তাঁরা কোন্ চোখে দেখেন তা আমার জানা নেই, তবে আমার বিচারে সাহিত্যের রাজ্যে এই মনোভাব যুক্তিযুক্ত নয়।

এই আলোচনার প্রথম দিকে আমি সমাজ, যুগ ও সংস্কৃতি কতটা শাশ্বত, কতটা চিরন্তন হ'তে পারে তা কিছুটা দেখাবার চেষ্টা করেছি। আমাদের কোন ক্রমেই ভুলে গেলে চলবে না যে সাহিত্য একটা বিজ্ঞান, একটা দর্শন—সাহিত্য বাস্তবের পটভূমিকায় মানুষের দর্পণ; সর্বোপরি সাহিত্য একটা ন্যায়নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্র, সাহিত্য একটা সুস্থ সামাজিক রূপায়ণের মুখপাত্র। অতএব সাহিত্যের ভিত্তি এই সমাজের মূলে। বিভিন্ন যুগে বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে মানুষ কি ভাবে এগিয়ে চলেছে সাহিত্য শুধু তার ইতিহাসই নয়, সাহিত্য তার ভাষ্যকার। তাই সে সমস্ত রকম অন্যায় অত্যাচারের বিধ্বংসী রূপ। সুতরাং মার্কসবাদ, যা একটা দর্শন, একটা মৌলিকতা, একটা সংস্কৃতি, সেই মার্কসবাদের তথা বিজ্ঞানসম্মত বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতেও সাহিত্য কতটা সার্থক তা আমাদের বিচার করতে হবে। "The method of creative art is a method of dialectic materialism"। এখানে আমাদের অনেকের অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ধারণাশক্তি কাজ করে। একটা কথা খুবই শোনা

পারে না, এগিয়ে যাবার কোন পথই দেখাতে পারে না। আসলে মানুষের জন্য কিছু করা, মানুষকে ভালবাসা—এই সবের মধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য ও বাঁচবার প্রেরণা নিহিত রয়েছে। অনিরুদ্ধ বরুণের সঙ্গে মিশেছে, মানুষকে বরুণের মত ক'রে ভালবাসতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারে নি। শেষে সন্দেহে আর অবিশ্বাসে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে।

একসময় ওর মনে হয়েছে মানুষকে ভালবেসে কিছু করতে যাওয়াটা অর্থহীন। এখানে সবাই পৃথিবীর সব কিছু; যে যার নিয়মে নিজস্ব কক্ষপথে বিচরণ করছে। তাই কারও জন্য কিছু করতে গেলে সেটা তার অধিকার আর স্বকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। এ পর্যন্ত যারা তা করতে গিয়েছে তারা শুধু সমস্যাকে বাড়িয়েই তুলেছে। বরুণও এক নেশায় ডুবে আছে।

হঠাৎ মনে পড়ল বরুণ একদিন বলছিল, 'একাকিত্বটা তোমার বিলাস।' অনিরুদ্ধ আবার নিজেকে বুঝবার চেষ্টা করে। অস্থিরতা আবার বেড়ে যায়। এই একাকিত্ব এই নিঃসঙ্গতা,—এগুলো ওর বিলাস! সেইজন্যই বাসবীর থেকে, বরুণের থেকে, সমস্ত কর্তব্য থেকে ও পালিয়ে বেড়াচ্ছে? নিজের মনে যুক্তি খাড়া ক'রে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে? উত্তেজনায় নিজের চুলের মুঠি শক্ত ক'রে চেপে ধরল অনিরুদ্ধ। মাথা নেড়ে সমস্ত কথা জোর করে অস্বীকার করার চেষ্টা করল। আসলে প্রত্যেকেরই একটা নিজ সত্তা আছে, ও ভাবতে চেষ্টা করল। আর সকলেরই নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলা উচিত। এই যে নিঃসঙ্গতা, এতে না ভুগে উপায় নেই। কেননা, জীবন একটাই, আর এই একটিমাত্র জীবনে ও পৃথিবীর সমস্ত রকম বৈচিত্র্যের স্বাদ পেতে চেয়েছিল। তাই না-পাওয়ার এই হতাশা, এই অস্থিরতা। কথাগুলোকে এভাবে সাজিয়ে নিয়ে ও একটু শান্ত হ'তে চেষ্টা করল। কিন্তু একটু পরেই মনে হ'ল এই ঘন অন্ধকারে ওর একাকিত্ব আর ঐ পালিয়ে বেড়াবার কথাটা কে যেন একটু আগে ঘোষণা করেছে, আর সেটা অন্ধকারের মধ্যে এখন নিঃশব্দে ভাসছে।

অনিরুদ্ধ থমকে দাঁড়াল। অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাল। ছুটে গিয়ে এক-সময় জোরে ড্রয়ারটা টানল। স্লীপিং পিলের প্যাকেটটা নিয়ে কুঁজো থেকে একগ্লাস জল ভ'রে আনল, হাঁ ক'রে সবগুলো পিল মুখে পুরে ঢক্ ঢক্ ক'রে জলটা খেয়ে নিল। আঃ, এতক্ষণে সব অবসাদের ওপর পরিতৃপ্তির এক প্রলেপ নেমে এল যেন! চোখের পাতা টেনে সামনের দিকে একবার দেখবার চেষ্টা করল। খোলা জানালায় রাতের আকাশ। ঘুম···সেই নিথর নিস্পন্দ পরম শান্তির ঘুমটা এইবার এগিয়ে আসছে···।

নিয়ে রচিত সাহিত্য,—অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ জীবনকে উপেক্ষা-করা যে সাহিত্য,—তা কখনই সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবী করতে পারে না।

এই ক্ষুদ্র পরিসরে এই রকম একটা বিরাট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, বস্তুচেতন সাহিত্য কখনই একটা সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ থেকে সাহিত্যটাকে নিছক রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলে না। বস্তুতান্ত্রিকতার যে দর্শন, সমস্ত সামাজিক সমস্যা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে বিচার করার যে প্রবণতা, তা কখনই সংকীর্ণতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না। যতই আমাদের এই ধরনের যুক্তিসঙ্গত আলোচনার পথ পরিসর হবে, যতই আমরা বস্তুতান্ত্রিকতার দর্শনকে, বিজ্ঞানকে, সংস্কৃতিকে উদারভাবে চিন্তা করতে পারব, ততই আমরা এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারব। এইভাবে আমরা গড়ে তুলব এমন এক সমাজব্যবস্থা যা সমষ্টিগতভাবে জীবনের মূল্যায়ন করবার কথা বলবে, মানসিক সাম্যকে তথা সামাজিক ও জাগতিক সাম্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে ব্যষ্টির বিকাশের কথা ভুলে গিয়ে সমষ্টির বিকাশের কথা বলবে,—মানুষ শাশ্বত অ্যাবসলিউট ধারণা ছেড়ে বস্তুকঠিন মৃত্তিকার কথা ভাববার অবসর পাবে।

"মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীত ভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে।……কোনো সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যতটা উৎপাদন শক্তির স্থান হতে পারে তার সমস্ত কিছুর বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে সামাজিক ব্যবস্থার কখনও বিচ্যুতি ঘটে না।" —কার্ল মার্কস

আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদ্ (১৯৬৭-৬৮)

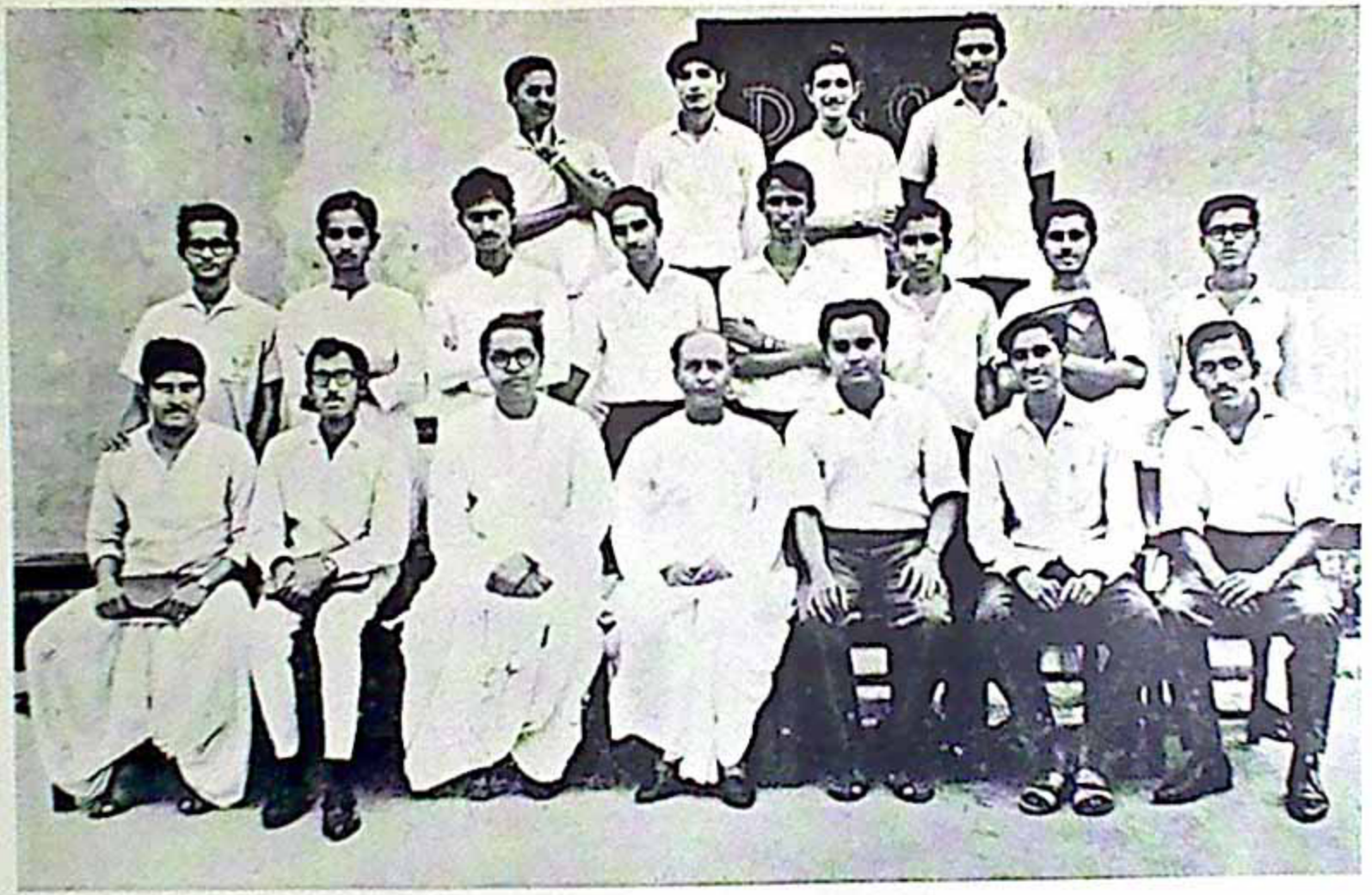

প্রথম সারিতে (বাঁ দিক্ থেকে)—শুভেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য (ক্যান্টিন সম্পাদক), তপন শেঠ (সহ-সভাপতি), উপাধ্যক্ষ পরেশচন্দ্র সেন, অধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ভূপতিরঞ্জন ভট্টাচার্য (সভাপতি), কার্ত্তিক সাহা (সাধারণ সম্পাদক), শৈলেন ভট্টাচার্য (ক্রীড়া সম্পাদক)।

দ্বিতীয় সারিতে (বাঁ দিক্ থেকে)—প্রণব চক্রবর্তী, বিকাশ চক্রবর্তী (বিতর্ক সম্পাদক), অজিত মুখার্জী, পবিত্র দে সরকার (সহ-সাধারণ সম্পাদক), সোমনাথ মুখার্জী, তপন

আর আমি এই এক নিম্নস্তরের ভাব নয়। সাক্ষাৎভাবে, তোমার শরীর আর আমার শরীর একান্তভাবে এক। এ অনুভূতি না থাকিলে একজনের শরীরের আঘাত অপরের শরীরে অঙ্কিত হইতে পারে না।

পরমহংসদেবের আর একটি ঘটনা। বর্ষার জলসিঞ্চিত নবদূর্বাদল আস্তরণে উদ্যান ভরিয়া উঠিয়াছে। ঐ দূর্বাদলের উপরে অন্যের পদসঞ্চারণার ফলে পূর্বের ন্যায় পরমহংসদেব ঘরের ভিতর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। জিজ্ঞাসান্তে জানা গেল, ঐ পদচারণশীল ব্যক্তির পদাঘাতে নবদূর্বাদলের দেহে যে যন্ত্রণা সেই যন্ত্রণাবোধই তাঁহার অস্বস্তির কারণ। মহাপুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান-প্রসূত প্রেম সমগ্র মনুষ্যজাতি, পশুজগৎকেও অতিক্রম করিয়া উদ্ভিদ্‌-জগতে প্রবেশ করিয়াছে।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে মহামানবের মনে-প্রাণে উদ্ভূত এই মহাপ্রেম তিনি কি ভাবে শিষ্যদের মধ্যে সংক্রামিত করিতেছেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার সেবনের মধ্যে প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দকে নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিলেন।

এইবার স্বামীজীর উপর আদেশ হইল, তপস্যাদি ত্যাগ করিতে হইবে। জনগণের মুক্তির জন্য সর্বভারত তাঁহাকে পরিক্রমা করিতে হইবে। আদেশক্রমে স্বামীজী ভারত-বর্ষের সর্বত্র পদব্রজে ভ্রমণ করিলেন। সমাজের সমস্ত স্তরে,—অতি নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে গিয়া তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন। দেবভাব যে মানুষে অবস্থিত, যাহা তাঁহার গুরুর বাণী এবং সর্বত্র তিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন, সেই দেবতা-অধ্যুষিত ভারতের সাধারণ মানুষ বহু শতাব্দীর উৎপীড়নে, অত্যাচারের ফলে একেবারে পশুপদবীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের রক্ষা করা তো দূরের কথা, কেহ তাহাদের একটু সমবেদনা, এমন কি একটু ভালবাসা বা প্রেমও জানায় না। তাহাদের এরূপ অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী পাগলপ্রায় হইলেন। প্রায় এই সময়েই বিশ্ব-ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য তিনি ভারত হইতে প্রতিনিধিস্বরূপ আমেরিকায় যান। তথায় তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। এই অবকাশে পাশ্চাত্য সমাজের ভাবধারা সম্বন্ধেও তিনি অবহিত হ'ন। আমেরিকায় অবস্থানকালে একদিন তিনি এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মেঝের উপর শুইয়া সারারাত্রি ভারতের সাধারণ দুর্গতদের জন্য কাঁদিয়া কাটাইলেন এবং 'মা'র কাছে বলিলেন, "মা, এখানে লোকে ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্যচুষ্য খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে! মা, তাদের কোন উপায় হবে না?" তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্যে তিনি ধর্মদান করিতে যান নাই। "ওদেশে ধর্মপ্রচার করে এদেশের লোকের যদি অন্নসংস্থান করা যায়!"

স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া জনসাধারণের দুর্গতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে মিশন ও মঠ স্থাপন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ শিক্ষাপ্রসারের কথাও উল্লেখ করিলেন। পাশ্চাত্য ভ্রমণে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যুগে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বুলি আওড়াইয়া

হাসিমুখে একসঙ্গে ছুটে আসতে দেখেছি, 'কি হ'ল, চাকরীটা হবে মনে হচ্ছে?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আমার নেতিবাচক উত্তর শুনেছে তখন মুহূর্তের জন্যও তাদের মুখের উপর আষাঢ়ের কালো মেঘ লেপে আসতে দেরী হয় নি। যতখানি উৎসাহভরে তারা এসেছিল ততোধিক নিরুৎসাহ হ'য়ে তারা ফিরে গেছে। তাই বাধ্য হ'য়ে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা আশ্বাস দিতে শুরু করলাম যে কিছুদিনের মধ্যেই অফিস থেকে 'অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট লেটার' পাঠাবে বলে দিয়েছে। এমনি ভাবেই তারা বহুপ্রতীক্ষিত একটা চিঠির অপেক্ষায় থেকে অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে যেত। কিন্তু কি আশ্চর্য, দুবেলা ভাতের থালা হাসিমুখে এগিয়ে দিতে তাদের এতটুকু ত্রুটি হয় নি। ভেবে পেতাম না এই রেশনের অল্প কোটায় কি ক'রে তারা আমাকে দুবেলা ভাত রেঁধে দেয়? অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে জিজ্ঞেস করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণ ক'রে আর জিজ্ঞেস ক'রে উঠতে পারি নি।

কিন্তু সব রহস্যই একদিন না একদিন উদ্‌ঘাটিত হয়। তাই আজ যখন ভাত-টাত খেয়ে-দেয়ে প্রস্তুত হ'য়ে ইণ্টারভিউ দিতে যাবার আগে মৌরী নেওয়ার জন্য রান্নাঘরে ঢুকেছি তখনই মাকে অপ্রস্তুতের মতো চীৎকার ক'রে উঠতে শুনেছি, 'তুই আবার এখানে এলি কেন? যা দরকার—ডাকলেই তো পারতিস?' আমার দরকারের কথাটা বলতে গিয়েই হঠাৎ কণ্ঠরোধ হ'য়ে এলো। দেখি বোন উনুনে জল ঢেলে আঁচ নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করছে আর মা তাড়াতাড়ি আমার এঁটো থালার উপর জল ঢেলে এমন একটা ভাব করল যেন এইমাত্র ভাত খেয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আমার দুবেলা একথালা ক'রে ভাত জোটে কোত্থেকে? সমস্ত পরিস্থিতিটি অনুমান ক'রে যেমন দ্রুতপদে এসেছিলাম ঠিক তেমনি দ্রুতপদে ঘর থেকে চলে গেলাম।

'বাবু, ঝালমুড়ি চাই?'

একটা ফিরিওয়ালা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি কিছু না বলে পকেট থেকে খুচরো পয়সাগুলো বার ক'রে গুনে দেখলাম আঠারো পয়সা আছে। বাড়ী ফিরতে বাস্-ভাড়া লাগবে পনেরো পয়সা। কাজে কাজেই—

'এই নিন, বাবু—'

ফিরিওয়ালা ততক্ষণে একটা ঠোঙা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কত দাম?'

'বার নয়া।'

বললাম, 'ভাই, অত পয়সা তো আমার কাছে নেই। তুমি বরং দু'-পয়সার দাও।'

'হুঁ! দু'-পয়সার ঝালমুড়ি!' বলে ফিরিওয়ালা এমন কতকগুলো মন্তব্য আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল যা খুব শ্রুতিমধুর নয়। শত চেষ্টা

আশুতোষ কলেজ রবীন্দ্র-পাঠচক্র (১৯৬৭-৬৮)

প্রথম সারিতে (চেয়ারে বসে, বাঁ দিক থেকে)—প্রণব চক্রবর্তী (সম্পাদক, রবীন্দ্র-পাঠচক্র), অধ্যাপক ভূপতিরঞ্জন ভট্টাচার্য (সভাপতি, ছাত্রসংসদ), অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায় (সভাপতি, রবীন্দ্র-পাঠচক্র), অধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য, উপাধ্যক্ষ পরেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক সাহা (সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রসংসদ)।

দ্বিতীয় সারিতে (বাঁ দিক থেকে)—বিকাশ চক্রবর্তী, পার্থ মজুমদার, স্বপন পাল, তপন চক্রবর্তী, প্রদীপ দাশগুপ্ত, শৈলেন ভট্টাচার্য, সত্য দাস, দীপক শর্মা, পবিত্র দে সরকার।

কৃতজ্ঞতার খাতিরে আমায় কিছু একটা সংধান ক'রে দিতে পারেন না? এখন তো ধরা-কওয়ারই যুগ পড়েছে!

আর দেরী করলাম না। ছুলটা নিয়ে ওঁদের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওঁরা দু'জনে কি একটা কথায় খুব মশগুল ছিলেন। আমি গিয়ে ওঁদের পাশে দাঁড়াতেই ওঁরা দু'জনে একসঙ্গে মুখ ঘোরালেন। আমি ভদ্রমহিলার দিকে ছুলটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'মাপ করবেন, এই ছুলটা, মানে, আপনার কান থেকেই বোধ হয় খুলে পড়ে গিয়েছিল?'

ভদ্রমহিলা চিলের মতো আমার হাত থেকে ছুলটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, 'ও মাই গুডনেস্! দেখেছ অমিত, তোমার জ্বালায় আর একটু হ'লে এই ঝুমকোটা হারাতে বসেছিলাম।' তারপর ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে একটু কৃত্রিম হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ!'

ভদ্রলোক কিছু বললেন না। শুধু আমার দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্ত তাকিয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আমি তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু ভাববার চেষ্টা করলাম, কি ক'রে নিজের কথা বলতে শুরু করব। আমাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভদ্রমহিলা রঙিন চশমার ভিতর দিয়ে একবার আমার দিকে তাকালেন। চোখেমুখে এবার কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা বা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল। ভদ্রলোকের উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'দাও না, একটা টাকা বার ক'রে দাও না। দেখছ না লোকটা কিছু সাহায্যের জন্ত দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় নিরিবিলিতে বসে দুটো কথা বলব তারও কি উপায় আছে!'

ভদ্রলোকও এবার বিরক্তিভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে একবার তাকালেন। তারপর ব্যাগ থেকে একটা টাকা বার ক'রে আমার দিকে তুলে ধরলেন।

লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে আমার সর্বাঙ্গ জলে উঠল। তবু যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত ক'রে বললাম, 'দেখুন, আমি ঠিক এর জন্ত, মানে, আমার একটু অন্ত বক্তব্য ছিল—'

ভদ্রলোক আমাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ রকম প্যান্‌প্যানানি অনেক শুনেছি। যত সব—' বলে টাকাটা আমার সামনে ছুঁড়ে দিলেন।

আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। পারিপার্শ্বিক সবকিছু বিস্মৃত হ'য়ে ভদ্রলোকের মুখের উপর সজোরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলাম। ভদ্রলোকও আচমকা অপমানিত হ'য়ে রুখে উঠলেন, আর ভদ্রমহিলা সুযোগ বুঝে 'চোর চোর' ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে 'মার মার' রব ক'রে অনেক লোক ছুটে এল এবং কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার সর্বাঙ্গে বহুলোকের কিল, চড়, লাথি বৃষ্টির ধারার মত ঝরে পড়ল। আস্তে আস্তে

প্রসঙ্গে

ধ্যায়

ম্পাদক

ওয়া প্রায় বাৎসরিক ঘটনার মতো হয়ে
থেকে শুরু করে শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ
থাকেন। প্রায় প্রত্যেক বছরই দেখা
প্রশ্ন হওয়ার অভিযোগে ছাত্ররা পরীক্ষা
আসছেন। বিক্ষোভ কখনও কখনও
করে শিক্ষক, অধ্যাপক এবং ইনভিজি-

পত্র ও ভগ্ন চেয়ার-টেবিলের ছবি ফলাও
নানা মত প্রতিফলিত করে থাকেন।
তিক দলগুলির খপ্পরে পড়ে উচ্ছৃঙ্খল
য়িত্ব শেষ করছেন। আবার কেউ-বা
হী। এ সব মতামত প্রকাশের মাধ্যমে
সমাধান হচ্ছে না। তবে এঁরা,—যিনি
প্রত্যেকেই একটা কথা স্বীকার করেন,
ক্ষযজ্ঞ-কেন্দ্র ছিল না। ঘটনাটা সাম্প্রতিক

বাংলা দেশের ছাত্রসমাজ একদিন স্বপ্নেও
দের এক সময়ে "ফাওয়ার্স্ অব্ বেঙ্গল"
ঙ্খল, অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠছে? কারণ,
ন আদর্শবোধ ছিল, আজ যা নেই।
আদর্শবোধের পরিবর্তে স্থান নিয়েছে নিছক
তিবান্ বলে যারা পরিচিত, তাদের বেশীর
অদ্ভুত ধরনের ঔদাসীন্য গড়ে উঠছে।
একদিন ত্যাগ স্বীকার করতে শিখিয়েছিল

ভিড়ের কাছে এগিয়ে গেছে টের পাই নি। বার্ধক্য সম্বন্ধে উদাসীন একদল বৃদ্ধ অফিস টাইমে এই ঝামেলার প্রতিবাদে মুখর। একদল নিস্পৃহ দর্শক। একদল ব্যস্ত সমবায়ী।

খ

এগিয়ে ভীড়ের কাছে যাই—অনেকটা নিশি-পাওয়া লোকের মতো। আমার চেহারাও তখন কম বীভৎস নয় বোধ হয়! দেখে পথ ছেড়ে দেয় সবাই। লাইট-পোস্টটা রক্তাক্ত। নিচে থেঁতলানো শরীরটা দুমড়ে ছোট একতাল মাংসের স্তূপের মতো পড়ে আছে। মাথাটা অস্পষ্ট। কাঁধের ওপরের বাকি অংশে একটা বাজারের থলি জড়িয়ে আছে অনেকটা ঠিক ক্রুদ্ধ সাপের মতো। ড্রাইভারটা পালিয়ে গেছে। কনডাক্টর পারে নি। তাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে ভীষণভাবে মারধর করতে একদল ব্যস্ত। কেউ কেউ আবার ক্ষীণকণ্ঠে তার প্রতিবাদও করছে। বাসের মহিলা যাত্রীরা ভয়ে কুঁকড়ে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে শিউরে উঠলাম। মৃত্যুর আতঙ্কিত ছায়া প্রত্যেকের মুখে কাঁপছে। মৃত্যুকে এতো কাছে দেখে আমিও শিউরে উঠলাম। গেঞ্জীটাও ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে যাওয়ায় সারা শরীর ঠক্ ঠক্ করছে যেন! "পুলিস স্টেশন, অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করা হয়েছে তো?"—কে যেন চীৎকার ক'রে বলল। রুমাল দিয়ে মুখ ঘসে আবার তাকাই লাইট-পোস্টটার দিকে। থেঁতলানো শরীরটার পাশে থলিটা তেমনি পড়ে। ভিতরে অক্ষত কোয়ার্টার পাউণ্ডের পাউরুটি উঁকি মারছে একটা। একটা হাত বিকৃতভাবে তার দিকে তখনও প্রসারিত। চারিদিকে কথার ঝড়।

গ

অথচ লোকটাকে কেউ চেনে না।

"মানবজীবন একটি অখণ্ড পূর্ণতা মাত্র। রাজনৈতিক জীবন, নাগরিক জীবন ও সামাজিক জীবনকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন জীবন মনে করা যেতে পারে না। ভিতর থেকে একটা আদর্শ উদ্ভূত না হলে নাগরিক জীবন সুন্দর ও পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীনতা ছাড়া সেই আদর্শ উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নয়।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

বা অন্যত্র এই ধরনের আচরণ সুস্থ, রাজনৈতিক-সচেতন ছাত্র-আন্দোলন গড়ে ওঠার পথেও বিরাট প্রতিবন্ধক। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানা অব্যবস্থাকে দূর করতে হ'লেও শৃঙ্খলাকে বাদ দিলে চলবে না। যুক্তির দৃঢ়তাও বিশৃঙ্খলার গহ্বরে পড়লে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়।

অবশেষে আর একটি কথা বলা খুব প্রয়োজন বলে মনে করি। তা হ'ল—এ ব্যাপারে ছাত্রসংগঠনগুলোর প্রচুর দায়িত্ব আছে, কারণ ইদানীংকালে প্রায়ই দেখা যায় যে ছাত্ররা পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার জন্য এবং প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে বলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের এ দাবীর মধ্যে সময় সময় কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও বেশীর ভাগ সময়েই এ সব বিক্ষোভ সুবিধাবাদী মনের থেকেই আসতে দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে ছাত্রসংগঠনগুলোর দায়িত্ব বড় কম নয়। ছাত্রদের এই ধরনের মানসিক প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং সঠিক পথে ছাত্রদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করাই ছাত্রসংগঠনগুলোর অন্যতম কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। কিন্তু দুঃখের কথা, বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ছাত্রদের এ সকল বিক্ষোভকে যুক্তিবিচার না করেই সমর্থন জানায়, ফলে এদের সেই সমর্থন ছাত্রদের বিভ্রান্তির পথেই এগিয়ে নিয়ে যায়। ছাত্রসংগঠনগুলির সব সময়ই ছাত্রদের 'ভ্যান্গার্ড' হওয়া উচিত, কিন্তু কার্যতঃ অনেক ছাত্রসংগঠনই ভ্যান্গার্ড না হয়ে তাদের টেল (Tail) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই, ছাত্রসংসদের একজন প্রাক্তন সম্পাদক হিসেবে ছাত্রসমাজের কাছে এবং ছাত্রসংগঠনগুলির কাছে আমার আবেদন, বৃহত্তর ছাত্র-আন্দোলনের স্বার্থে সঠিকভাবে সমস্ত সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে সত্যিকার ছাত্র-কল্যাণের পথে এগিয়ে আসুন।

"যা আর কেউ শেখায় তা শেখা যায় না। যা নিজে শিখি তাই আসল শিক্ষা। বাস্তবিকতা বর্জিত হলে মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হয়ে যায়।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই নীতির উপরই এই স্কীম্ গঠিত। কিন্তু কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ যারা পাবে না তাদের বিকল্প ব্যবস্থা কি হবে তা নিয়ে কোন সুগঠিত স্কীম্ না থাকায় কলেজে ঢোকা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের গতি নেই। এর ফলে প্রতি বছরই বহু ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হ'তে গিয়ে কলেজের দোরে মাথা খুঁড়ে মরলেও ভর্তি না হয়ে ফিরে আসেন। কাজেই এই নিয়ন্ত্রণ স্কীম প্রত্যাহারের দাবীতে এ বছর D. S. O.-র উদ্যোগে সারা বাংলাদেশব্যাপী যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়, তাতে আমাদের ইউনিয়নও সক্রিয়ভাবে যোগদান করে।

গত ২১শে নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে বাংলাদেশের নানা স্থানে ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক মিলিতভাবে আন্দোলন করে। আমাদের ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বপন রায় চৌধুরী, বিধান চ্যাটার্জী, তারাদাস ব্যানার্জী ও বর্তমান ক্রীড়া-সম্পাদক শৈলেন ভট্টাচার্যও এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার বরণ করেন। আমাদের ইউনিয়নের ছাত্রবন্ধুরা এর বিরুদ্ধেও সমবেত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

শহীদ দিবস

গত ১লা সেপ্টেম্বর সারা বাংলাদেশব্যাপী যে 'শহীদ দিবস' পালন করা হয় আমাদের ইউনিয়নও তাতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে এবং ঐ দিন 'শহীদ দিবস' পালন ও খাদ্যের দাবীতে D. S. O.-র উদ্যোগে যে সভা ও মিছিল হয় তাতে আমাদের ইউনিয়নের পরিচালনায় কলেজ থেকে ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল যোগদান করে।

আমাদের ভর্তি সমস্যা

এ বছর আমাদের কলেজ থেকে প্রিঃ ইউঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রবন্ধুরা যখন কলেজে পুনরায় ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হতে আসেন তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান যে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না এবং বিজ্ঞানে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিজ্ঞান বিভাগে নেওয়া যাবে না। কারণ অধিকতর যোগ্য অপর ছাত্রদের বঞ্চিত ক'রে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ছাত্রদের সুযোগ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ইউনিয়নের তরফ থেকে আন্দোলন ক'রে কর্তৃপক্ষের মত পরিবর্তন করিয়ে আমরা তাঁদের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হই এবং এইরূপ প্রতিটি ছাত্রবন্ধুকেই কলেজে ভর্তি করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানের ছাত্ররাও বিজ্ঞান বিভাগেই ভর্তি হবার সুযোগ পান। আমরা আশা করি এইসব ছাত্রবন্ধুরা পরবর্তী পরীক্ষায় তাঁদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আমাদের আন্দোলনের মুখরক্ষা করবেন।

চীপ স্টোর্স

১৯৫৮ সালে কলেজে ছাত্রবন্ধুদের জন্য যে চীপ স্টোর্সের প্রবর্তন হয় এবছর আমরা তার

ঝিক্‌মিক্ করছে। কুলিরা অবিশ্রান্ত গাইতি চালাচ্ছে তার মধ্যে। ওদের চেহারাও কয়লার মতই। এক-একটা গ্রানাইটের চাঙড় যেন! মুখে-চোখে আদিম বোধহীন দৃষ্টি। অথচ ওরাই কিন্তু ধরতে গেলে আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা! অন্ততঃ তার প্রধান সহায়ক তো বটেই!

এক জায়গায় একটা 'ডাইক্' দেখলাম। এদিকে শরীর ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সারা গায়ে ঘামে, কয়লার গুঁড়োয় মাখামাখি। বদ্ধ বাতাস কার্বনের গুঁড়োয় ভর্তি। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলাম। সেদিন ঐ পর্যন্তই।

তার পরদিন সকাল বেলা আবার বেরোলাম। এসেছি পর্যবেক্ষণে। এই পরিচিত পৃথিবীকে এতদিন যে চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম সে চোখে নয়, আজ দেখছি ভূতাত্ত্বিকের চোখে। পৃথিবী এখন আমাদের কাছে বিজ্ঞানের ভাষায় একটা 'স্পেসিমেন' (Specimen)। নানা জায়গায় সুন্দর সুন্দর সব 'এক্সপোজার' (Exposure) রয়েছে। পৃথিবীর সুপ্ত রহস্যগুলো সেখানে বে-আব্রু হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সুস্পষ্ট শিলাস্তরগুলোকে অবাক্ চোখে দেখে বেড়ালাম। "আমরা এখন বরাকর সিরিজের (Barakar Series) ওপর দিয়ে চলেছি"—অধ্যাপক অজয়বাবু বললেন, "এর নীচে তালচির সিরিজ (Talchir Series) আর সব নীচে আর্কিয়ান্ সিরিজ (Archæan Series)"।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। পাহাড়ের ওপর পীচের রাস্তা কোথাও ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে, কোথাও সোজা খাড়া ভাবে উপরে উঠে গেছে। কোথাও আবার রাস্তাই নেই, পাথর আর লাল মাটির উঁচুনীচু ঢিপি। চার পাশটা ফাঁকা। মাঝে মাঝে সাঁওতালদের নিকোনো কুঁড়ে চোখে পড়ে। নিখুঁত নৈপুণ্য আছে তাতে। সমস্ত অঞ্চলটায় একদিকে অ্যাম্‌ফিবোলাইট (Amphibolite) রয়েছে, আর একদিকে গ্র্যানাইট (Granite)। মাঝখানে একজায়গায় গ্র্যানাইট্ আর অ্যাম্‌ফিবোলাইট্-এর সঙ্গমস্থল (Contact zone) দেখলাম। কোথাও চোখে পড়ল বড় বড় গোল তালচির বোল্ডার (Talchir Boulders)। পথে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির পড়ল, সেখানেও গেলাম।

তৃতীয় দিনে মাইথন বাঁধের যে দিকে জল আটকে রাখা হয়েছে সেখানে লঞ্চ ভাড়া করে ঘুরলাম। ওখানকার পাওয়ার হাউস্‌টাও দেখা হ'ল।

অবশেষে ফেরার পালা। তৃতীয় দিন বিকেলে বাসে চ'ড়ে আসানসোল স্টেশনে এসে গেলাম। ট্রেন আসবে একটু পরে। অপেক্ষা করতে লাগলাম। সঞ্চয়ের ঝুলিতে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে চলেছি আমাদের অভ্যস্ত জীবনে কলকাতায়।

সাহায্য ভাণ্ডার

এবছর আমরা প্রায় ৮০০ টাকা দুঃস্থ ছাত্রবন্ধুদের সাহায্য করেছি। আগামী বছর থেকে এইড্ ফাণ্ড ফি প্রতিটি ছাত্রবন্ধুর কাছ থেকে ১৲ টাকা ক'রে ধার্য ক'রে এই ভাণ্ডারকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে। আশা করি আগামী ইউনিয়ন এই কার্যে সফল হবে।

ব্রেকেজ চার্জ

কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছ থেকে সাধারণভাবে যে ব্রেকেজ চার্জ নেওয়া হ'ত তা ছাত্রদের সহনশক্তির অতিরিক্ত মনে হওয়ায় ছাত্র ইউনিয়ন এটি কমাবার চেষ্টা করেন। কর্তৃপক্ষ আংশিকভাবে তাঁদের দাবী মেনে নিয়েছেন।

সাংস্কৃতিক বিভাগ

সাংস্কৃতিক বিভাগে এবছর আমরা যথেষ্ট উন্নতিসাধন করতে পেরেছি।

নবীন বরণ উৎসব ॥ গত ২৪শে সেপ্টেম্বর কলেজ হলে 'নবীন বরণ উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, যে, সমস্ত অনুষ্ঠানই কলেজের ছাত্রবন্ধুদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়।

বার্ষিক উৎসব ॥ গত ২৭শে জানুআরি মহাজাতি সদনে কলেজের 'বার্ষিক উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বহিরাগত বহু শিল্পী আমাদের এই উৎসবে অংশগ্রহণ ক'রে ছাত্রবন্ধুদের আনন্দ প্রদান করেন। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে এ রকম উৎসবেও বহিরাগত শিল্পীদের পরিবর্তে ছাত্রশিল্পীরাই সম্পূর্ণভাবে আনন্দদানের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

প্রতিযোগিতা ॥ এবছর গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় বহু ছাত্র অংশগ্রহণ করেন। কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণও করা হয়।

শরৎ-সম্মিলনী ॥ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা এ বছর কলেজ হলে 'শরৎ-সম্মিলনী' করি। এই সম্মিলনী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সভার আয়োজন করা হয়। সম্মিলনীতে 'পথিকৃৎ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মানিক মুখার্জী ও রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র গুপ্ত আমন্ত্রিত হ'য়ে ভাষণ দেন।

সম্বর্ধনা উৎসব ॥ গত সাধারণ নির্বাচনে আমাদের কলেজের দু'জন প্রাক্তন ছাত্র—শ্রীযুক্ত চিত্ত রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ পুরকায়েত—যথাক্রমে এম. এল. এ. ও এম. পি. নির্বাচিত হন। উভয়েই এস. ইউ. সি পার্টির মনোনীত। আমরা কলেজে উভয়ের এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করি। উক্ত সভায় অধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন এবং ভাষণ দেন অধ্যাপক ভূপতিরঞ্জন ভট্টাচার্য, ছাত্রসংসদ্-সম্পাদক কার্তিক সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উভয়কে মানপত্র ও অন্যান্য উপহার দেওয়া হয়।

ভিয়েৎনাম প্রশ্নে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার এই বিচ্ছিন্নতা আর মুক্তিফৌজের ক্রমাগত সাফল্য আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে প্রায় ক্ষিপ্ত, বেপরোয়া করে তুলেছে। আক্রমণের তীব্রতা বাড়াতে গিয়ে নিজেরাই তারা যুদ্ধজালে জড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন অর্থনীতি আজ যুদ্ধ-অর্থনীতিতে পর্যবসিত। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে কোণঠাসা হয়ে পড়ায় আজ সে উত্তর ভিয়েৎনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু তাতে তার সংকট আরও বাড়ছে। আর এইখানেই ভিয়েৎনাম যুদ্ধের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব। এ যুদ্ধে কেবল ভিয়েৎনামী জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নই জড়িত নেই, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ-বিরোধী জনগণের মুক্তি-আন্দোলনের স্বার্থ—আর মার্কিন সামরিক শক্তির আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজ, তার রাজনীতি, তার অর্থনীতি, তার ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব—এক কথায় তার প্রায় সব কিছু। তাই আজকের বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এ সংগ্রাম আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করেছে। আজ এ যুদ্ধে আমেরিকা পরাজিত হ'লে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে দেখা দেবে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশ-বাদ-বিরোধী মুক্তি-আন্দোলন—আর সে মুক্তি-আন্দোলনের প্লাবনে হয়তো সাম্রাজ্য-বাদের শেষ চিহ্নটুকুও দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে।

সোভিয়েৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই বিভিন্ন দেশের মুক্তি-আন্দোলনকে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন লেনিনের আদর্শ অনুযায়ী সর্বতোভাবে সাহায্য করছিল। কিন্তু আজ সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ভিয়েৎনামে যে সামান্য সাহায্য পাঠাচ্ছে তা দিয়ে আমেরিকার মত শক্তিশালী বিপক্ষকে খতম্ করা যায় না। "আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা" ও "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" নীতির নামে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন এমন কতকগুলি নীতি অনুসরণ করেছে যার ফলে তাদের মৌলিক আদর্শই হয়তো ব্যাহত হচ্ছে। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন হয়তো বর্তমানে ভাবছে আজ যদি সে ভিয়েৎনামে সর্বতোভাবে সাহায্য করে তবে আবার একটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চাইলেও আজ আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ খোদ আমেরিকাতেই জনগণের এক ক্রমবর্ধমান অংশ ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদধ্বনি তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন অন্য রাষ্ট্রগুলিও আজ আর যুদ্ধে আসতে রাজী হবে না, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে—সুতরাং আবার সে ঝুঁকি নিতে এরা নিশ্চয়ই প্রস্তুত নয়। এর প্রমাণ এরা প্রত্যেকেই আমেরিকার পরাজয় দেখে ভিয়েৎনামে সৈন্য পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে।

পরিশেষে খোদ আমেরিকাই কি আজ আর সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে আক্রমণ করবার সাহস পাবে?

ছাত্রবন্ধুদেরও সহযোগিতার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এঁদের মধ্যে জন্মেজয় বসু, প্রণব চক্রবর্তী, তপন চক্রবর্তী, দিলীপ মাইতি, প্রমথেশ রায়, পবিত্র দে সরকার প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে।

কার্তিক সাহা

সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রসংসদ্

সাংস্কৃতিক বিভাগ

এবারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে কলেজে আমরা কয়েকটি নতুন নজির স্থাপন করেছি। সাংস্কৃতিক সম্পাদকরূপে কার্যভার গ্রহণ করার পরেই আমরা চারটি বিভাগে কলেজের সংস্কৃতি পরিষদ্‌কে ভাগ ক'রে দিই। এগুলি হ'ল—আবৃত্তি, সাহিত্য, নাটক ও সংগীত। এগুলির সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে, অজিত মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত ঘোষ, সুশীল ভট্টাচার্য এবং পলাশ মুখোপাধ্যায় (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইনি প্রখ্যাত গায়ক স্বর্গত মলয় মুখোপাধ্যায়ের অনুজ।)

আবৃত্তি বিভাগেও আমরা এবার নতুন নজির স্থাপন করেছি যাকে বলা যায় আমাদের কলেজে প্রথম "আন্তঃকলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা"। এতে বহু কলেজের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিযোগিতায় যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাঁরা হলেন—

প্রথম—সুভাষ বসু (বিদ্যাসাগর কলেজ)

দ্বিতীয়—অঞ্জনকুমার দত্ত (মেডিকেল কলেজ)

তৃতীয়—অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (আশুতোষ কলেজ)

বিষয় : সুকান্ত ভট্টাচার্যের "বোধন"।

বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন মঞ্চ, বেতার ও চলচ্চিত্রের অন্যতম অভিনেতা শেখর চট্টোপাধ্যায়, বেতারশিল্পী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিল্পী ও কবি আবুল কাসেম রহিমুদ্দিন। অনুষ্ঠান-শেষে পুরস্কার এবং অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীরদকুমার ভট্টাচার্য।

বাৎসরিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার তিনটি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু সময়াভাবে একটি অধিবেশনের ফলাফলের উপরই পুরস্কার বিতরণ করা হয় বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

প্রথম—সুশীল ভট্টাচার্য (প্রথম বর্ষ : বাংলা : সাম্মানিক)

দ্বিতীয়—অজিত মুখোপাধ্যায় (দ্বিতীয় বর্ষ : ভূগোল : সাম্মানিক)

তৃতীয়—প্রমথেশ রায় (দ্বিতীয় বর্ষ : ভূগোল : সাম্মানিক)

৩$\frac{১}{৭}$ > π > ৩$\frac{১০}{৭১}$

বা

৩'১৪২৮ > π > ৩'১৪০৮

তিনি ত্রিকোণমিতির $\sin\theta < \theta < \tan\theta$ সূত্রের সাহায্যে প্রথম প্রমাণ করে দেখান যে, π-এর মান প্রায় $\frac{২২}{৭}$। টলেমি বলেন, π-এর মান ৩°৮′৩০″ বা ৩'১৪১৬ হওয়া উচিত। গারবার্ট π-এর মান সংক্ষেপে ২ ধরবার পরামর্শ দেন।

ভারতবর্ষের গণিতবিদ্‌রাও যে এর মান নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন সে বিষয়ে অনেক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এঁদের মধ্যে বৌধায়ন, আর্যভট্ট ও ভাস্কর প্রমুখ গণিতজ্ঞের নাম উল্লেখযোগ্য।

বৌধায়ন হিসাব করে বলেছিলেন, πএর মান $\frac{৪৯}{১৬}$।

আমরা পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস দেখে বলি নিউটন হচ্ছেন ক্যালকুলাসের (Calculus) আবিষ্কারকর্তা, কিন্তু আমাদের ভারতীয় ইতিহাস দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করে, নিউটনের পূর্বে আর্যভট্ট ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন। এই প্রখ্যাত গণিতবিদ্ দেখান যে, একক ব্যাসের কোন বৃত্তে যদি n এবং $2n$ বাহুবিশিষ্ট দুটি বহুভুজ আঁকা যায় এবং তাদের একটির বাহু-দৈর্ঘ্য যদি যথাক্রমে a এবং b হয়, তবে

$$b^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-a)^{\frac{1}{2}}$$

সূত্রের সাহায্যে দেখান যায়

π = $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$ বা ৩'১৪১৬

ভাস্কর প্রমাণ করেন

π = $\frac{৩৯২৭}{১২৫০}$ = ৩'১৪১৬।

বা

π = $\frac{৭৫৪}{২৪০}$ = ৩'১৪১৬।

আরবের বিখ্যাত পণ্ডিত, গণিতবিদ্ আলকারিজম্ বলেন, π-এর মান

$\frac{২২}{৭}$, √১০, $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$।

চীনের গণিতবিদ্ সু চং চিও বলেন,

৩'১৪১৫৯২৬ > π > ৩'১৪১৫৯২৭

অধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ভূপতিরঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায় এবং পূর্বোল্লিখিত বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলী। এঁদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয়েজয় বসু
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

রবীন্দ্র-পাঠচক্র

সাহিত্য ও শিল্পচেতনার উৎকর্ষ সাধনের মানসে ১৯৩৪ সালে কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রবন্ধুর প্রচেষ্টায় 'রবীন্দ্র-পাঠচক্রে'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেদিন থেকে সমস্ত বিভাগের উৎসাহী ছাত্রবন্ধুদেরই এতে যোগ দেবার অধিকার রয়েছে। তাই ছাত্রবন্ধুদের কাছে আবেদন, তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে সংস্থাটির শক্তিবৃদ্ধি করতে তাঁরা এগিয়ে আসুন।

নানা কারণে অন্যান্য বছরের তুলনায় কলেজে কাজের সময় এ বছর অনেক কম পাওয়া গেছে, ফলে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের তালিকাও এবার কম। পৃথিবীর বহু জায়গায় বিশ্ববিখ্যাত মহান্ সাহিত্যিক গোর্কির শতবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীসলিল গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আমরাও তাঁর শতবার্ষিকী পালন করি। অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতে ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা হিসাবে অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার জন্য এঁদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

সংস্থার সভাপতি শ্রীযুক্ত সলিল গঙ্গোপাধ্যায়কে সংস্থার বিভিন্ন কাজে তাঁর মূল্যবান্ পরামর্শ ও সহযোগিতা দানের জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর স্মরণ করি ছাত্রবন্ধুদের—বিশেষ ক'রে সুভাষ সেনগুপ্ত, বিকাশ চক্রবর্তী, পবিত্র দে সরকার, রণদেব সরকার, দীপ্তভানু দত্ত, অজিত মুখোপাধ্যায় ও পার্থসারথি মজুমদারকে—যাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে ও সক্রিয় সহযোগিতায় পাঠচক্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

পরিশেষে আমাদের কাজে যা-কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেল আমাদের পরবর্তী ছাত্রবন্ধুরা এর পর তাঁদের কর্মকুশলতায় তা সম্পূর্ণ করবেন ও পাঠচক্রকে আরও সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলবেন এই আশা নিয়ে আজ বিরতি শেষ করছি।

প্রণববন্ধু চক্রবর্তী
হীরকশুভ্র পাণ্ডে
যুগ্ম-সম্পাদক

সালে ৪০০ দশমিক স্থান পর্যন্ত এবং ১৮৫৫ সালে ৫০০ দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধভাবে π-এর মান বের করেন।

এ তো গেল বড় বড় পণ্ডিতের কাজ। আমাদের মত সাধারণ ছাত্রেরাও থিওরী অব্ প্রবাবিলিটির (Theory of Probability)

$$\frac{2l}{\pi a} \text{ এবং } \frac{6}{\pi^2}$$

সূত্র দিয়ে π-এর মান বের করতে পারি। তা ছাড়া আরও সহজভাবে একটা বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত বের করলে π-এর মান পাওয়া যায়। *

আমি অভিনয় ভালবাসি

(শ্রীযুক্ত সবিতাব্রত দত্তের সঙ্গে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার)

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে একটি উজ্জ্বল নাম মুকুন্দদাস। দেশাত্মবোধক গান রচয়িতা এবং গায়ক হিসাবে পরাধীন বাংলায় তাঁর নাম অবিসংবাদী ছিল। সেই চারণ কবি মুকুন্দদাসের জীবনীচিত্র দেখার আগ্রহ পোষণ করছিলেন বাঙ্গালী দর্শক। অবশেষে প্রমোদকরমুক্ত হয়ে "চারণ কবি মুকুন্দদাস" মুক্তি পেল রুপালী পর্দায়। রসিক দর্শক মাত্রেই জানেন সবিতাব্রত দত্ত নিজের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন মুকুন্দদাস চরিত্রে। বর্তমান বৎসরে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে আকাদেমী পুরস্কারও পেয়েছেন শ্রী দত্ত "এণ্টনী কবিয়াল" অভিনয় ক'রে। আমি—তথা এই কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী সকলেই এই শিল্পীর জন্য গৌরব বোধ করি—কারণ তিনি আমাদের কলেজেরই একজন প্রাক্তন ছাত্র। পাঠকদের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রী দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম রূপকার-কক্ষে। সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণটি এই সঙ্গে তুলে ধরছি।

---

* এই প্রবন্ধ রচনার সূত্রগুলি দিয়ে সাহায্যদানের জন্য শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার দত্ত মহাশয়ের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।

আগের বছরের মতই এবারও এই ইণ্টার-কলেজ ফুটবল লীগ-এর খেলা শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

এই বছর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় (Inter-UniversityTournament) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খেলার জন্য আমাদের কলেজের পাঁচজন ছাত্র সুযোগ পান। এঁরা হলেন—শ্রীঅমিতাভ ঘোষ, শ্রীমোহন সিং, শ্রীসুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার, শ্রীশেখর বিশ্বাস, শ্রীশ্যামসুন্দর মান্না।

প্রতি বছরের মত এবছরও আমাদের কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বাধিক পয়েণ্ট অর্জন ক'রে শ্রীসুবোধকুমার সাঁতরা চ্যাম্পিয়ন্ হবার সম্মান লাভ করেন। গত কয়েক বছর বিভিন্ন অসুবিধার জন্য অধ্যাপক বনাম ছাত্রদের প্রদর্শনী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'তে পারে নি। এবছর আবার ঐ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। বিজয়ী হন অধ্যাপক দল।

আমাদের কলেজ টেণ্টটির অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। ক্রীড়া-সম্পাদকের দায়িত্ব পাবার পর প্রথমেই আমি ঐ টেণ্টটির সংস্কার সাধনে তৎপর হই। আমি ওর কিছুটা উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছি। আমার অসমাপ্ত কার্য নতুন সম্পাদকের হাতে ন্যস্ত রইল। তা ছাড়া এতদিন ধরে কলেজের ক্রীড়া-বিভাগের আর্থিক দুরবস্থার জন্য খেলোয়াড়দের উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া সম্ভব হ'ত না। এবার আর্থিক সংকটের মধ্যে থেকেও চেষ্টা করেছি খেলোয়াড়দের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে। প্রয়োজনের তুলনায় সেটা যথেষ্ট না হলেও আরও বেশী দেওয়া সম্ভব ছিল না।

ক্রীড়া-সম্পাদকের গুরু কর্তব্য পালনে আমি আমার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অকুণ্ঠ সহায়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রাধেশ্যাম ঘোষ, অধ্যাপক প্রভাত রায় ও অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী আমাকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। এঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ ছাড়া আমার ছাত্রবন্ধুগণ—যথাক্রমে সর্বশ্রী কার্তিক সাহা, কুণাল চট্টোপাধ্যায়, গণেশ চক্রবর্তী, তপন শেঠ, সুশান্ত মিত্র, তড়িৎ দাস ও অন্যান্য ক্রীড়ানুরাগী ছাত্ররা সর্বদা আমাকে সাহায্য করেছেন।

আজকের দুনিয়ায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলাধুলোর উপযোগিতা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আমি একান্তভাবে আশা করব যে আমার পরবর্তী ক্রীড়া-সম্পাদকেরা ক্রীড়াজগতে আমাদের কলেজের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য তৎপর হবেন। জয় হিন্দ্!

শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ক্রীড়া-সম্পাদক

—আপনার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় কোন্‌টি ?

—আমি প্রচুর অভিনয় করেছি। কোন একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় আমার সর্বশ্রেষ্ঠ এ কথা কি করে বলি ? আমার প্রতিটি অভিনয়ই আমার ভালো লেগেছে। (যাঁরা ব্যাপিকা বিদায়, এণ্টনী কবিয়াল, চারণ কবি মুকুন্দদাস দেখেছেন, তাঁরা জানেন এর প্রত্যেকটিতেই শ্রী দত্তের অভিনয় শ্রেষ্ঠ পর্যায়ভুক্ত বলা চলে।)

—আপনি তো সংগীতচর্চাও করেন ?

—হ্যাঁ, তবে অভিনয়ের বাইরে আমি গান গাই না।

—আবৃত্তিতেও আপনার প্রচুর সুনাম আছে। আপনি কি অভিনয় ছাড়া আবৃত্তি করেন না ?

—হ্যাঁ, কোন কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি আবৃত্তি করি।

শ্রী দত্তের কণ্ঠে যাঁরা নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন শ্রী দত্তের কণ্ঠস্বরে কি মাধুর্য আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উনি অভিনয়ের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছেন যে প্রতি মাসে গড়ে ৩৫।৪০টি অভিনয় করতে হচ্ছে। তাই আবৃত্তির সময় পাচ্ছেন না।

আমি উঠে পড়লাম। একজন শিল্পী যে কত ভদ্র, কত উদার হতে পারেন, সবিতাব্রত দত্তকে না দেখলে তা বোঝা যাবে না। ওঁর মূল্যবান্ সময় নষ্ট করবার জন্য ক্ষমা চেয়ে, এবং এই সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে রূপকার-কক্ষ থেকে বিদায় নিলাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম আপনাদের উপহার দেবার জন্য আমার সেই মধুর ক্ষণের স্মৃতিটুকু।

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।" —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশুতোষ কলেজ নূতন ছাত্রাবাস

ছাত্রাবাসের অধীক্ষক অধ্যাপক এস. ভট্টাচার্য-সহ আবাসিকবৃন্দের একাংশ

আশুতোষ কলেজ পুরাতন ছাত্রাবাস

ছাত্রাবাসের অধীক্ষক অধ্যাপক এম. মুখোপাধ্যায় ও কলেজের অধ্যক্ষ এন. কে. ভট্টাচার্যের সঙ্গে আবাসিকবৃন্দের একাংশ

। চার ।

দরজায় কে যেন নক্ করলো।

বামুন-ঝি বোধ হয়।

না, পিওন।

জয়ন্তর চিঠি!

সত্যি শেষ পর্যন্ত তাহলে ও চিঠি দিয়েছে!

কিন্তু—

ঘরটা যেন দুলছে। কেউ বোধ হয় জাপান থেকে একটুকরো ভূমিকম্প এনে ছেড়ে দিয়েছে বনানীর শোবার ঘরটাতে। অস্পষ্ট দৃষ্টিতে জয়ন্তর চিঠিটা বনানীর ঠিক মর্মস্থলে গেঁথে রইলো।

"আগামী সোমবারে আমার বিয়ে। দশ হাজার টাকা পণ পাচ্ছি; ভাবছি একটা ব্যবসা করবো। আমাকে ভুলে যাও। ইতি—জয়ন্ত চট্টো—।"

। পাঁচ ।

রামগোপালবাবু দাড়ি কামাচ্ছিলেন।

বিরাট বাড়ী।

তিনতলা।

বনানী ঢুকলো।

—আপনি কি বিবাহিত?

—না।

—আমাকে বিয়ে করবেন?

রামগোপালবাবু মুখ থেকে সাবানগুলো মুছে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রামগোপাল-বাবুকেই দেখেন।

। ছয় ।

অনেকদিন আগে বনানী টবে একটা দামী গোলাপের কলম-চারা লাগিয়েছিলো। ছোট্ট ছোট্ট পাতা হচ্ছিল। আর একটা কুঁড়ি। রোজ জল দিচ্ছিল। ফুলটা ফুটলে কী ভালো লাগবে বনানীর! ওর হাতে বোনা গাছের প্রথম ফুল! গাছটা বোধ হয় বৃষ্টির আশায় ছিলো এ্যাদ্দিন। বনানী যখন রেজেস্টারী অফিস থেকে ফিরে এল তার একটু পরেই বৃষ্টি নামলো। শিলাবৃষ্টি।

। সাত ।

পরের দিন গাছটার গোড়ায় জল দিতে গিয়ে বনানী দেখলো, গাছটার পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে ঝুলে গেছে, আর কলিটা মাটির ওপরে পড়ে আছে।

কিছু দিনই বন্ধ থাকায় আর কিছু করা সম্ভব হয় নি। তাই যা কিছু হয়েছে ঐ দেড় মাসের মধ্যে।

এবছর প্রথমে উৎসাহী ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে একটা 'বিতর্ক-পরিষদ্' গঠন করা হয় এবং এই পরিষদের উদ্যোগে ছ'টি বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক পরিচালনার মধ্যে যা একটু নূতনত্বের স্বাদ এনেছিল তা হল "সারা বাংলা আন্তঃকলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতা"। এই প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "Limitation of student eurolment in colleges is not conducive to the academic interests of the country". ইংরেজি ও বাংলা ছ'টি ভাষাতেই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজিতে শ্রেষ্ঠ দলের পুরস্কার গ্রহণ করেন লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ এবং শ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার গ্রহণ করেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র পিটার অ্যামোলো ওটিয়াম্বো। আর বাংলায় শ্রেষ্ঠ দলের সম্মান লাভ করেন যোগমায়া দেবী কলেজ এবং শ্রেষ্ঠ বক্তা বলে স্বীকৃত হন মৌলানা আজাদ কলেজের ছাত্র বলরাম বসু। আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে ইংরেজি বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন কুণাল চট্টোপাধ্যায় ও বিকাশ চক্রবর্তী।

পুজোর ছুটির পর অনেকদিন কলেজ বন্ধ থাকার দরুন এবছর 'বার্ষিক বিতর্ক-সভা'র আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। তাই বিতর্ক-পরিষদের প্রতিযোগিতার ফলাফলের ওপর নির্ভর করেই গুণানুসারে চারজনকে পুরস্কার দেওয়া হয়—বিকাশ চক্রবর্তী, সুশীল ভট্টাচার্য, সুব্রত সেনগুপ্ত ও অশোক দাসকে। এ ছাড়া 'সারা ভারত এইচ্. সি. মুখার্জী স্মৃতি বিতর্ক-প্রতিযোগিতা' ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এক বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হয়। শেষোক্ত প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের তৃতীয় বার্ষিক সাহিত্য বিভাগের ছাত্র কুণাল চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

অধ্যাপক গোপাল ত্রিবেদী মহাশয়কে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। শুধু এটুকু বলতে চাই, তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে কাজ করা সহজ ছিল না। অন্যান্য অধ্যাপকেরাও সহযোগিতা ক'রে ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিতর্কের সামগ্রিক মানোন্নয়নে আরও অধিক সংখ্যক অধ্যাপকদের সহযোগিতা দরকার।

সবশেষে জানাই, এবার বিতর্ক পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে বঙ্গবীর চক্রবর্তী ও পার্থসারথি মজুমদারের ওপর। তাঁদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

বিকাশ চক্রবর্তী
বিতর্ক-সম্পাদক

ক্যালকুলেশন! সমস্ত রিসার্চ্ ইন্‌স্টিটিউটে আপনার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। চলুন, চলুন, সবাই আপনাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে।"—আনন্দের আতিশয্যে ইগোর কোটিয়ার হাত ধরে টানতে আরম্ভ করলো।

হঠাৎ যেন বহুদূর থেকে কথার ফুলকিগুলো ভেসে এলো। ইগোর চমকে উঠলো। —"মিঃ ইগোর, আমার মা চলে গেলেন কাল রাত্রে। আমি এখন একা। এই মহাশূন্যের একটা অরবিটালে এখন আমি একা ঘুরছি। আমি আর বাঁচবো না।" কোটিয়ার হাতটা তখন ইগোরের হাত থেকে খসে পড়েছে।

ইগোরের মনে হ'লো ঘরটা যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে কোটিয়ার মার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ। সত্যি, অমন মা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলো না সে। শুধু বললো—"মিস্ কোটিয়া, জানেন তো পৃথিবীর সৃষ্টির রহস্য নিয়ে কত থিওরী আছে। একটা থিওরী হচ্ছে—কোন একটি বিরাট তারা নাকি ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের উপরে এসে পড়ে। সূর্যের খানিকটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আর তার ফলে পৃথিবীর সঙ্গে আরো গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। সবাই তখন একা একা ঘুরতে থাকে। যেমন আপনি, আমি, সকলেই। ঠিক আপনি যা বললেন তাই। কিন্তু সবচেয়ে সুখের কথা কি জানেন? সে সূর্য কিন্তু পৃথিবীকে ভুলে যায় না। একটা আকর্ষণ টিকে থাকে দুজনের মধ্যে, যার জন্য আমরা, এই মানুষেরা বেঁচে থাকি—বেঁচে আছি। আপনিও বেঁচে থাকবেন। তা ছাড়া—"

কথা থেমে যেতে কোটিয়া নিষ্প্রভ চোখে তাকায়। জিজ্ঞাসু চোখে খুব আস্তে প্রশ্ন করে—"তা ছাড়া—?"

—"তা ছাড়া অন্য গ্রহেরও তো পৃথিবীর উপর আকর্ষণ আছে।"

"কি বলতে চান আপনি? বেরোন। এখনই বেরিয়ে যান। আমাকে একটু একা থাকতেও দেবেন না কি আপনারা?"—উত্তেজিত হয়ে প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠে কোটিয়া।

মাথাটা নিচু ক'রে বেরিয়ে যায় ইগোর।

* * *

ইগোর অন্যমনস্কভাবে গাড়ী চালাচ্ছে। দুর্বল মুহূর্তে সে তার এতদিনের অব্যক্ত কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছে। কিন্তু এই কি বলার উপযুক্ত সময়? ছি ছি, সে কি করেছে! নিজের উপরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লো সে। মনকে যেন ভেঙে চুরমার ক'রে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে তার।

* * *

কোটিয়া সোফায় বসে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল শুকিয়ে ফেলেছে। সেও নিজের অসংযত বাক্যের জন্যে ভীষণভাবে অনুতপ্ত। নিজেকে প্রশ্ন করে—সত্যিই কি তার

আবাসিকদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এঁদের মধ্যে অমিতাভ সেনগুপ্ত, তরুণ ঘোষাল, দিলীপ মাইতি প্রভৃতির নাম বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে।

এবারকার (১৯৬৬-৬৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আমাদের আবাসিকরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বি. এ. ও বি. এস্‌সি. পার্ট্ ওয়ান্ পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৮০, ও পার্ট্ টু পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৯০। তেমনি খেলাধুলাতেও আমাদের কৃতিত্ব নেহাৎ অবহেলার নয়। আমাদের আবাসিক বন্ধু—ছাত্রাবাসের ক্রীড়া-বিভাগের সম্পাদক—শ্রীশ্যামসুন্দর মান্না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হ'য়ে হায়দারাবাদে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

চিরাচরিত প্রথায় নূতন হোস্টেলের সঙ্গে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা কোনটাই অনুষ্ঠিত হয় নি; তবে খেলার মূল উদ্দেশ্য যদি 'প্রেম-প্রীতি-বিনিময়' হয় তবে তা আমরা পালন করেছি হোলি-উৎসব ও সরস্বতীপূজার মাধ্যমে। সাধারণ সম্পাদক হিসাবে 'মেসিং কমিটি'র সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং কিছুটা উন্নতি করতে পেরেছি। লাইব্রেরীর 'শ্রী' উন্নয়নে কমন রুম সেক্রেটারী মন্ট্ পালের কাজ আবাসিকবৃন্দের কাছে বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল। আমরা আমাদের স্বল্প পুঁজি নিয়ে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদিগকে কিছুটা সাহায্যও করতে পেরেছি।

ছাত্রাবাসের বিভিন্ন ব্যাপারে অধীক্ষক মহাশয়ের আন্তরিকতার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রীতি-সম্মিলন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যাওয়া আবাসিকবৃন্দের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অরূপরতন সাহা
সাধারণ সম্পাদক

ছাত্র-সাহায্য ভাণ্ডার

দায়িত্বটা যখন প্রথম আমার উপর এল তখন আশা ছিল অনেক কিছু করবার, কিন্তু বছরের শেষে আজ আর পরিপূর্ণ সাফল্যের আনন্দ নিয়ে বলতে পারছি না, যা আশা করেছিলাম তা সব করতে পেরেছি। 'ইউনিয়ন ফাণ্ড' যে বরাদ্দ টাকাটা ছাত্রবন্ধুদের জন্য পাওয়া যায় তার পরিমাণটা বাড়াবার জন্য একটা পরিকল্পনা ছিল প্রথম থেকেই, কিন্তু হয়ে ওঠে নি নানা কারণে। প্রথমতঃ কলেজের কার্যকাল এবার কম পাওয়া গিয়েছে। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য একটা চ্যারিটি শো করব ঠিক হয়েছিল, কিন্তু তা সময়াভাবে ও অন্যান্য কারণবশতঃ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এ ব্যাপারে ছাত্রবন্ধুদেরও আশানুরূপ সহযোগিতা পাই নি।

ঘুম

প্রণব চক্রবর্তী

তৃতীয় বর্ষ : বিজ্ঞান

পায়চারি করতে করতে ঘরের মাঝখানটায় এক সময় থেমে পড়ে অনিরুদ্ধ। ওকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হয়। রাত শেষ হতে চলল, ঘুম এখনও এল না; চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে একসময় কিছু চুল মুঠো করে চেপে ধরল। ঘুম আর আসবে না। দিনের বেলা বদ্ধ বাতাসে হাঁপিয়ে ছুটোছুটি করে সময় কাটে আর রাতে শুধু পায়চারি করে মুহূর্ত গোনা। ঘুম···দীর্ঘ একটানা চেতনাশূন্য গভীর ঘুম·····সে ঘুম ও কতদিন ঘুমোয় না!

পুরোনো প্যাটরাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ওটার মধ্যে মা-বাবা-ঠাকুমার নানা জিনিস ইতিহাসের উপাদান হয়ে জমে আছে। ওর একান্ত শৈশবে ও ঠাকুমার সঙ্গে বসে রোজ সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুরের গান গাইত, প্রার্থনা করত। আজকের পৃথিবীতে ঠাকুমা নেই, ঠাকুর নেই, মৃত্যুর পর পরলোকের আশ্বাস নেই, ঘুম নেই।

এর পর এই বিনিদ্র রাতের শেষে কর্মব্যস্ত এক দিন আছে। কিন্তু কাজ, কর্তব্য —এ সব ওর কাছে বড় নীরস—বড় একঘেয়ে মনে হয়। কলেজে পড়ার সময় এক একটা টিউশানি একমাস কি দু'মাস করবার পর একঘেয়ে লাগত। টিউশানি ছেড়ে এক অ্যাডভোকেট ভদ্রলোকের পি. এ.-র কাজ নিল, সেখানেও বাঁধাধরা নিয়মের চাপে হাঁপিয়ে উঠল ও। তারপর অফিসের চাকরী, সেল্‌স্‌ম্যানের কাজ—কোন কিছুতেই বেশীদিন ও মন বসাতে পারে নি।

একদিন বাসবীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। প্রথমটা মনে হয়েছিল, এ বুঝি জীবনে নিশ্চিন্ত আনন্দের আবির্ভাব। কিন্তু না, বাসবীর মধ্যে মাদকতা আছে, আশ্বাস নেই। উপরন্তু ওর মনে হ'ল বাসবী ওর উপর তার প্রভাব ছড়িয়ে ওর সত্তার পরিপূর্ণতা খর্ব করবে, ওর সব বিশেষত্বের অবলুপ্তি ঘটাবে।

দেখেশুনে বাসবী ঠোঁট টিপে হাসে, বলে, 'অ্যানার্কিস্ট'।

ওর বন্ধু বরুণ ওকে বলে 'আত্মকেন্দ্রিক'। বরুণ বলেছে আত্মকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ বলেই আজ ওর এত হতাশা, এত বিষাদ, এত ক্লান্তি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই নাকি এই আত্মকেন্দ্রিক চেতনার উৎস। এই চেতনা মানুষকে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু দিতে

চীপ্ ক্যান্টিন

এমন একটা সময়ে আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যখন প্রত্যেকটি খাদ্যই অগ্নিমূল্য। তবুও চেষ্টা করেছি কম দামে যতটা ভাল খাবার দেওয়া যায়। কিন্তু আমার এই প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড় অসহযোগ করেন খাদ্য-দপ্তর—র‍্যাশন পারমিট না দিয়ে। তবুও ক্যান্টিনের উন্নতিসাধনে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম—শস্তায় না হোক, কম দামের কিছু খাবার তৈরীর পরিকল্পনায়, আর সে ব্যাপারে কিছুটা সাড়াও পেলাম। তবুও ক্যান্টিন যে ভাবে চলার কথা সে ভাবে চলে নি। তার প্রধান কারণগুলো হলো :

(১) ক্যান্টিনের অবস্থান চারতলায়।

(২) শ্যামাপ্রসাদ কলেজের ক্যান্টিনের ভার অপর একজনের হাতে।

(৩) অবিক্রীত খাদ্যের বিক্রী সমস্যা।

(৪) বিক্রীর ফলে যে স্বল্প মুনাফা হয় তদ্দ্বারা পরিচালনার ব্যয়ের ঘাটতি।

(৫) কলেজের উৎসবে খাবারের অর্ডার না পাওয়া। (এ বছর একটি অর্ডার পাওয়া গিয়েছিল।)

এতোগুলো সমস্যা থাকা সত্বেও অধ্যাপকমণ্ডলী, অধ্যক্ষ ও ছাত্রবন্ধুদের কাছ থেকে যে সহানুভূতি পেয়েছি তা ভুলবার কথা নয়, বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ভূপতিরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ভূতত্ব-বিভাগীয় অধ্যাপকরা যে ভাবে আমায় প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছেন।

শুভেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য
সম্পাদক

"আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? পাশ্চাত্য জাতির কাছে শিখিবার অনেক আছে। যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তির বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।"— স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
পত্রিকাধ্যক্ষ

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
পত্রিকা-সম্পাদক

অধ্যাপক ভূপতিরঞ্জন ভট্টা
সভাপতি, ছাত্রসংসদ্

কার্ত্তিক সাহা
সম্পাদক, ছাত্রসংসদ্

রণদেব সরকার
পত্রিকা-সম্পাদক

বিভক্ত : অ—ছ (১ম খণ্ড), জ—ম (২য় খণ্ড), প—ব (৩য় খণ্ড), ভ—হ (৪র্থ খণ্ড)। প্রথম খণ্ড সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। সেই বৈচিত্র্য লোকসঙ্গীতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে যত সাবলীলভাবে ধরা পড়ে, এমন আর কিছুতে নয়। তথাকথিত শিক্ষার পালিশহীন গ্রামীণ মানুষগুলো তাঁদের আবেগ-আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতিকে এইসব গানে ধরে রেখেছেন। এক এক ধরনের গানের সঙ্গে আমরা শুধু নামে পরিচিত, কিছু-বা তাদের নাগর-রীতিতে গীত গায়ককণ্ঠে শুনে থাকবো। কিন্তু বিনা প্রসাধনে অকৃত্রিম সৌন্দর্যে উল্লসিত ভাবনার প্রকাশ গ্রামীণ গায়কদের স্বভাব-সুন্দর কণ্ঠে যে ভাবে ধরা পড়ে—নগর-পরিবেশে তা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা পাই বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য লোকসঙ্গীতের মধ্যে ঝুমুরগান ও নাচের বিস্তারিত পরিচয়। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের নানা কাহিনী নানাভাবে লৌকিক গানে বিধৃত। ঝুমুরগানের মধ্যে আমরা আর্য-অনার্য সংস্কৃতির প্রকাশ লক্ষ্য ক'রে থাকি। উদাহরণ ও সংজ্ঞা দিয়ে তার পূর্ণ পরিচয় লেখক তুলে ধরেছেন। টুসু-গান, তর্জাগান ইত্যাদি থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন গানের উদাহরণ এই খণ্ডে সংকলিত। বিভিন্ন অঞ্চলের দূর গ্রামের ভেতরে গিয়ে আশুতোষবাবু নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শারীরিক ক্লেশকে তুচ্ছ ক'রে যে ভাবে গ্রামের মাটির মানুষগুলোর কাছ থেকে এই গানগুলি সংগ্রহ করেছেন তা বিস্ময়কর। যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে এই দুরূহ কর্মে আত্মনিয়োগ করা যায়, আশুতোষবাবু সেই সুদুর্লভ গুণের পরিচয় এখানে রেখেছেন। বাঙলাদেশের দুই প্রান্ত লোকসঙ্গীতের দ্বারা যেমন সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যেও তেমনি বিস্ময়কর।

তৃতীয় খণ্ডে প্রাধান্য পেয়েছে পাঁচালী, নানা ধরনের প্রেমসঙ্গীত, বিবাহের গান ও বাউল গান। এই বিভিন্ন ধরনের গানের বৈশিষ্ট্য, রূপ ও রীতি উদাহরণ সহযোগে এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এই গানগুলো পরোক্ষভাবে বাঙলার সামাজিক ইতিহাস বলা চলে। কারণ গীত-রীতি ও নৃত্য-রীতির মধ্যেও বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব ও সমন্বয় দেখা যায়। ভাষা, ভাবধারা, চিন্তার পারস্পরিক প্রভাব কি ভাবে মিশতে মিশতে আজ একাকার হ'য়ে গেছে—তার পরিচয় এর মধ্যে ধরা পড়েছে। বিভিন্ন ধর্মরীতির প্রকাশ যেমন সঙ্গীতে ধরা দিয়েছে, তার আবেগ-আকুলতাকে প্রকাশ করেছে, তেমনি দেখি বাউল গান, বিবাহের গানে বাঙালী সমাজের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে—তার বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ সব-কিছু। "বিবাহের গানের মধ্য দিয়াও বাঙলার সমাজ-জীবনের সংহতি সৃষ্টি হইয়াছে।"—এ মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য।

চতুর্থ খণ্ডটি নানাদিক্ দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে লোকসঙ্গীতের বাকী অংশগুলি

আলেয়া

তপনকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ : সাহিত্য

ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ধারে এসে বসলাম। এত তাড়াতাড়ি আর বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করল না। বাড়ী ফিরলেই তো সেই কতকগুলো একঘেয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সূর্য প্রায় অস্তগামী, সমস্ত আকাশ জুড়ে এক রঙিন আভা। গঙ্গার জল কল্ কল্ ছল্ ছল্ গতিতে বয়ে চলেছে। চারিদিকে অসংখ্য ছোট-বড় ঢেউয়ের মেলা। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেককে অতিক্রম ক'রে যেতে চায়। তার মধ্যে কেউ-বা অপেক্ষাকৃত বড় ঢেউয়ের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গঙ্গার বুকে মিশে যাচ্ছে, আবার কেউ-বা উদ্ধত ফণা বিস্তার করে আছড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেন এ সর্বনেশে খেলার শেষ নেই!

কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় হ'য়ে ঐ তরঙ্গলীলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর মনে মনে হিসাব করার চেষ্টা করলাম, আজকের ইণ্টারভিউটা ধরলে এক বছরে প্রায় ডজনখানেক ইণ্টারভিউ দিলাম। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই হয় দিন সাতেকের মধ্যে 'রিগ্রেট্' জানিয়ে চিঠি এসেছে, অথবা আজকের মতো মুখের উপরই ঘোষণা ক'রে দিয়েছে 'আন্‌ফিট্'। কিন্তু একটা কথা ভেবে আমি কূল পাই না যে কিসে আমি 'আন্‌ফিট্'? শারীরিক না মানসিক? জামার পকেট থেকে বি. এ. পাশের সার্টিফিকেটটা বার ক'রে চোখের সামনে ধরলাম। সুন্দর ইংরেজি হস্তাক্ষরে জলজল করছে 'বি. এ. অনার্স সেকেণ্ড ক্লাস'। ঐ লেখাটা পড়তে পড়তে আমার হাসি পেল। বছর দুয়েক আগে যখন এই রেজাল্ট বার হয় তখন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের আনন্দ দেখে কে! বাবা তো বাড়ীতে একটা ভোজেরই আয়োজন ক'রে ফেললেন। তারপর? তারপর বছরখানেক বাদে যখন বাবা এক বিবাহযোগ্যা মেয়েকে রেখে অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করলেন তখন থেকে শুরু হ'ল বাঁচবার জন্য সংগ্রাম। বি. এ. পাশের সার্টিফিকেটটা সম্বে ক'রে চাকরীর খোঁজে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু প্রায় বছর ঘুরতে চলল, শুধু ডজনখানেক ইণ্টারভিউ-ই দিয়ে গেলাম—অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার একটাও ভাগ্যে জুটল না।

প্রথম প্রথম যতবারই ইণ্টারভিউ দিয়ে বাড়ী ফিরেছি ততবারই মা-বোনকে

ভারতীয় অন্যান্য ভাষার পথনির্দেশক হবে। সেজন্যই বোধ করি এই দু'হাজারের অধিক পৃষ্ঠায় রচিত চারটি খণ্ড সুলভ মূল্যে প্রচারের জন্য সরকারী অর্থানুকূল্য লাভ করেছে। তাই একান্তমনে প্রার্থনা করি, আশুতোষবাবুর দীর্ঘদিনের সাধনা সফল হোক্—'বঙ্গীয়-লোকসঙ্গীত-রত্নাকর' বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে স্থান পেয়ে বাঙলাদেশকে যথার্থভাবে চেনার ও জানার সুযোগ এনে দিক। বাঙলাদেশের নিজেদের মধ্যকার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হোক—এইভাবেই গড়ে উঠুক্ জাতীয় সংহতি।

লোকশ্রুতি (ত্রৈমাসিক লোক-সাহিত্য সংকলন)। সম্পাদক: ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির দু'টি সংখ্যা আমরা দেখেছি। যে যুগে সিনেমা পত্রিকা ভিন্ন পত্রিকা চলে না বলে গুজব, গুরুগম্ভীর (serious) পাঠকের সংখ্যা নগণ্য বলে ধারণা—সে যুগে এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করা দুঃসাহসিক অভিযান-ই বলা চলে। বিভিন্ন আঞ্চলিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ও গীতি-ছড়া-ধাঁধাঁ ইত্যাদির সংকলন এই পত্রিকার উপজীব্য বিষয়। এই ধরনের পত্রিকা যদি বেঁচে থাকতে পারে, তার দ্বারা বাঙালীর সুরুচিবোধ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রীতি প্রমাণিত হবে। বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগী পাঠকদের দৃষ্টি (বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের) এদিকে আকৃষ্ট করছি।

অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূতুড়ে গল্প। সম্পাদনা—শ্রীইন্দ্রজিৎ রায়। প্রকাশক—শ্রীপ্রকাশ ভবন; ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলকাতা-১২। দাম দশ টাকা

এটি একটি ভূতের গল্পের সংকলন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু ক'রে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, সরোজ রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, নবেন্দু ঘোষ, গজেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ ৪৩ জন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিকের ৪৩টি গল্প এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

সাহিত্যে ভূতের গল্পের—যা নাকি বেশীর ভাগই অবাস্তব—স্থান কতখানি এ নিয়ে নীতিপন্থী দু'-চারজন সমালোচক বিরূপ মত পোষণ করলেও এ কথা অস্বীকার করবার

করেও ওর ঐ অপমানজনক মন্তব্যের প্রত্যুত্তর দিতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম পয়সা না থাকলে বোধ হয় প্রত্যেক লোকই এমন ভাবে অপমান করার সাহস পায়।

ছোটবেলাকার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম, বড় হ'য়ে জীবনে একটা কিছু করব। এমন কিছু করব যা আমাকে আজীবন অমর ক'রে রাখবে। আর পাঁচজনের মতো জন্ম-ভোগ-মৃত্যু—এ বাঁচা তো পশুর সামিল। জীবনে যদি পরের জন্য, দেশের জন্য কিছু না করতে পারলাম, তা হলে সে বাঁচাতে কি লাভ? পরক্ষণে এই ভেবে হাসি পেল, যে নিজের মা-বোনের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারে না সে ভাবছে পরের কথা—দেশের কথা! জীবনকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হ'ল।

হঠাৎ পিছনে খিলখিল শব্দে হাসির তরঙ্গ উঠতেই ফিরে তাকালাম। এক তরুণী ভদ্রমহিলা এক ভদ্রলোকের খুব কাছ ঘেঁষে উচ্ছ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। হাসির দমকে ভদ্রমহিলার সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভেবে পেলাম না, এরা এত হাসতে পারে কি ক'রে? ভদ্রলোককে কিন্তু কেমন চেনা চেনা মনে হ'ল। একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল, মাস দু'য়েক আগে এক সওদাগরী অফিসে এই ভদ্রলোকই তো আমার ইণ্টারভিউ নিয়েছিলেন! কিন্তু পরে সেই পোস্টে নিজেদের লোক নেওয়া হয়েছিল। ভদ্রলোকের পরনে একটা দামী স্যুট্। চোখে রঙিন চশমা। ভদ্রমহিলাও যতদূর সম্ভব আধুনিক পোশাকে সেজেছেন। ম্যাচ্ ক'রে শাড়ী-ব্লাউজ পরেছেন। পরিপাটী ক'রে খোঁপা বাঁধা, কিন্তু সে খোঁপা গতানুগতিক নয়। ঠোঁটে লিপষ্টিক, হাতে রিস্টওয়াচ। তাঁরও চোখে রঙিন্ চশমা। ওঁদের দেখে আমার নিজের মা-বোনের কথা মনে পড়ল। যুবতী বোন, বিধবা মা শতচ্ছিন্ন দু'-একটি কাপড়ের আড়ালে নিজেদের লজ্জা ঢাকার কি হাস্যকর প্রচেষ্টা ক'রে আসছে! আর নিজের কথা? সত্যি কথা বলতে কি, আজকাল নিজের দিকে তাকাতেই লজ্জা লাগে।

সহসা চোখ পড়ল, ভদ্রমহিলার প্রচণ্ড অস্থিরতার দরুন তাঁর কান থেকে একটা সোনার দুল মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু তাঁদের দু'জনের কারুরই কোন খেয়াল নেই। তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা দূরে একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে পাশাপাশি বসলেন। দুলটা তুলে নিলাম। ওটা নিয়ে কি করা উচিত ভেবে পেলাম না। একবার ভাবলাম, দুলটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বোনকে দিয়ে দিলে কেমন হয়? কিংবা—তার চেয়ে বরং দোকানে বিক্রি করলে কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। কয়েক দিনের খরচ চলবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল দারিদ্র্যের জন্য কি শেষ পর্যন্ত চোর হতে হবে? চকিতে একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। আচ্ছা, আমি যদি ওঁদের দুলটা ফেরৎ দিয়ে নিজের অবর্ণনীয় দুঃখের কথা ওঁদের নিবেদন করি, তা হলে ভদ্রলোক কি

নানা মতবাদ প্রচার ক'রে আসছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন সুষ্ঠু মীমাংসা হয় নি। বিজ্ঞান এখানে একেবারেই নিরুত্তর।

আমাদের মধ্যেও অনেকে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন—প্রবলভাবে করেন। এবং স্বচক্ষে ভূত দেখার নানা অভিজ্ঞতার কথাও অনেককে বলতে শুনেছি। এরা মানুষের উপকার কিংবা অপকার দুই-ই করতে পারে বলে তাঁদের ধারণা।

ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি আর নাই করি, সত্যিকার ভূতের গল্প পড়ে যে একটা রোমাঞ্চ-জাগানো আনন্দ পাওয়া যায় সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ এবং এই জন্যই কথাসাহিত্যের একটি শাখা হিসেবে ভৌতিক গল্পের নিশ্চয়ই একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। অলীক, অবাস্তব বলে তাকে কোন রকমেই অপাংক্তেয় ক'রে রাখা যায় না।

এই সুসম্পাদিত সংকলন-গ্রন্থটি পাঠ ক'রে সাহিত্য-রসিক মাত্রই আনন্দ পাবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সম্পাদক যে গল্প নির্বাচনে যথেষ্ট নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, সে কথা বলতে কোন বাধা নেই। তবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের দু'-একটি গল্প এই সংকলনে দেখতে পেলে আমরা আরও খুশী হতাম। 'স্যাটায়ার'-মূলক ভূতের গল্প রচনায় তিনি ছিলেন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই ধরনের কোন সংকলন-গ্রন্থেও তাঁর দু'-একটি রচনা না দেখতে পেলে পাঠক স্বভাবতঃই একটু হতাশ হবেন।

প্রকাশক যথেষ্ট যত্ন সহকারে বইটি প্রকাশ করেছেন। পুরু অ্যান্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা এই সচিত্র বইখানি অঙ্গসজ্জার দিক্ থেকেও পাঠকের কাছে তৃপ্তিদায়ক হয়েছে। ভিতরে অনেকগুলি ছবিও আছে এবং তা সু-অঙ্কিত। রঙিন প্রচ্ছদ-পটটিও সুরুচিপূর্ণ।

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

বিজ্ঞান-চেতনা। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ; সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী পাল। প্রকাশক—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির; ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীশংকর চক্রবর্তী, অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বনাথ মিত্র, অধ্যাপক স্নেহাংশু সেন, শ্রীকৃষ্ণবিহারী পাল, অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডঃ ননীগোপাল মজুমদার, অধ্যাপক সন্তোষ বসু ও শ্রীবিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়। মূল্য প্রতি খণ্ড চার টাকা।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় প্রাথমিক জ্ঞান না থাকলে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে বিজ্ঞানের সাহায্য আমরা গ্রহণ করে থাকি। কাজেই বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক ধারণা সর্বজনীন হওয়া দরকার।

চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হ'য়ে এল। একটা জমাট অন্ধকার ক্রমশঃ এসে আমাকে গ্রাস ক'রে ফেলল।

তারপর যখন আমার জ্ঞান ফিরল তখন আমি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে। সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা। মাথায় একটা প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ। শিয়রে কাকে যেন আমার নাম ধরে খুব করুণ স্বরে ডাকতে শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা করস্নেহস্পর্শ কপালে এসে ঠেকল। চোখ তুলে দেখি, শিয়রে মা-বোন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যেকার ফ্লুওরেসেণ্ট লাইটের উজ্জ্বল আলোয় তাদের চোখে কয়েক ফোঁটা জল চিক্ চিক্ ক'রে উঠল।

মহানির্বাণ

বিবেক রাউত

তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য

ম

ঝাঁকুনি দিয়ে বাস্‌টা থেমে গেল। আমার কোলে অর্থাৎ দু'হাঁটুর কোঁচকানো কাপড়ে কি যেন ছিট্‌কে এসে পড়ল। মাথার ঘিলু কি? শুধু কোলে নয়, আমার বাঁ-গালের জুলপির থেকেও দেখি রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁধ আর বুকের ওপর পড়ছে। পাঞ্জাবীটা রক্তে ভিজে জব্‌ জব্‌ করছে। চারিদিকে চীৎকার। বিরাট একটা ভয়ে চোখ বুঁজি।

হা

অধিকাংশ লোক বাস্‌ থেকে নেমে নিচের নিরীহ লাইট-পোস্টটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কে যেন আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলো—"কি হলো আপনার মশাই?" উত্তেজিত কয়েকটি যুবক চীৎকার করে উত্তপ্ত অশালীন ভাষায় বলছে, "ড্রাইভারকে নামিয়ে আনো, সাইড চেপে চালালে এ রকম হ'ত না।"

নি

কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে আসে। ধড়মড় ক'রে উঠে বাস্‌ থেকে নেমে পড়ি। এরই মধ্যে কখন একজন আমার কোলের থেকে সেই থেঁতলানো জিনিসটা তুলে নিয়ে নিচের

করা হয়েছে। দু'টি অংশই লিখেছেন সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবিহারী পাল। "পদার্থবিজ্ঞানের কথা" অংশে পদার্থ আর শক্তি, আর্কিমিডিসের গল্প, তাপের কথা, আলোর কাহিনী, শব্দের জগতে, চুম্বকের গল্প, তড়িৎ-বিজ্ঞানের রহস্য এবং "রসায়নের কথা" অংশে নানা ধরনের পদার্থ, কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধাতু, অক্সিজেন থেকে কার্বন প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ এবং সহজ, বক্তব্য স্পষ্ট। এই খণ্ডটি পাঠকদের ভাল তো লাগবেই, কাজেও লাগবে।

চতুর্থ খণ্ডটির আলোচ্য বিষয় 'বিজ্ঞান ও শিল্প'। এই খণ্ডটি লিখেছেন প্রধানতঃ অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ; অংশবিশেষ লিখেছেন শ্রীকৃষ্ণবিহারী পাল। কয়লা, আলকাতরা, কাঠ, নকল রেশম, লোহালক্কড়ের গল্প, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, কাচের কথা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, এক্স-রে, অ্যাটম ভাঙার কাজ, ক্যামেরা, সিনেমা প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে অতি সহজভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় শিশুসাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিমান্, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রেও এঁর খ্যাতি প্রচুর। কাজেই প্রধানতঃ তাঁরই লেখা এ খণ্ডটি এক-কথায় রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা চলে। সত্যিকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বলতে যা বোঝায় এটি তাই।

"মানবদেহের কথা" এবং "রোগজয়ের কথা" দু'টি অংশ স্থান পেয়েছে 'বিজ্ঞান-চেতনা'র পঞ্চম খণ্ডে। এ দু'টি অংশ লিখেছেন অধ্যাপক ডঃ ননীগোপাল মজুমদার। একাধারে খ্যাতনামা শিশু-চিকিৎসক এবং শিশুসাহিত্যেরও খ্যাতিমান লেখক হিসেবে ডঃ মজুমদার সুপরিচিত। তাঁর লেখা এ দু'টি অংশ সুলিখিত সন্দেহ নেই। এ দু'টি অংশে দেহযন্ত্র, রক্ত ও তার কাজ, হৃদ্‌যন্ত্র, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, পাচনতন্ত্র, নার্ভ, মাংসপেশী প্রভৃতি এবং যে সমস্ত মনীষীর অক্লান্ত সাধনায় কঠিন কঠিন সব ব্যাধি আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে তাঁদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

'বিজ্ঞান-চেতনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে "মানুষের কথা" এবং "প্রত্নতত্ত্বের কথা" নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীবিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সন্তোষ বসু। "মানুষের কথা" অংশে আদিম মানুষ, তাদের রূপ ও স্বরূপ, বিভিন্ন ধরনের মানুষ, খাদ্য উৎপাদনের যুগ, বর্বরতা থেকে সভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বত্র সুলিখিত না হলেও বইটি তথ্যবহুল হয়েছে। "প্রত্নতত্ত্বের কথা" বিষয়টি এ ধরনের গ্রন্থে নতুন সংযোজন। অধ্যাপক বসু অতি সহজ ভাবেই বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

প্রতিটি খণ্ডেই কিছু কিছু ছবি দেওয়া হয়েছে, তবে তার সবগুলি খুব উচ্চাঙ্গের নয়। তবু বলব, মোটের উপর 'বিজ্ঞান-চেতনা' বাংলা ভাষায় পপুলার সায়ান্স হিসাবে একটি বড় অভাব মিটিয়েছে। স্কুল-কলেজের প্রতিটি গ্রন্থাগারে তো বটেই, তা ছাড়া প্রতিটি সাধারণ পাঠাগারেও এ বইটি রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি।

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রতিবেদন

ছাত্রসংসদ্

কয়েকটি কথা

১৯৬৭ সালে ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হ'য়ে যেদিন দায়িত্ব গ্রহণ করি সেদিন দুরু-দুরু বক্ষে ভেবেছিলাম, বাংলাদেশের বৃহত্তম কলেজগুলির অন্যতম আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সেই গৌরবময় ভূমিকা আমার পক্ষে বহন করা সম্ভব হবে কিনা ? সেদিন ভয় যেমন পেয়েছিলাম, তেমনি মনে ছিল অদম্য সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা—আর আমার অগণিত ছাত্রবন্ধুদের সমর্থন লাভের আশা। এগুলিকে পাথেয় ক'রে আমি আমার কাজ শুরু করি। আজ দীর্ঘদিন বাদে যখন সমস্ত কাজের হিসাব-নিকাশ করতে বসেছি তখন আবার সেই প্রথম দিনকার মত দুরু-দুরু বক্ষে ভাবছি—কী পেরেছি—আর কী পারি নি ? কিন্তু নিজের কাজের বিচার নিজে না ক'রে আমার প্রিয় ছাত্রবন্ধুদের কাছে বিচারের ভার দিলাম। তাদের রায়-ই খুশী মনে মাথা পেতে নিতে পারব—এ বিশ্বাস আমার আছে।

ছাত্রসংসদের দায়িত্ব গ্রহণ ও উদ্দেশ্য

১৯৬৭ সালে বিগত ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমি ছাত্রসংসদের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। তখন আমার কাজকে আমি দু'ভাগে ভাগ করে নিই। প্রথমতঃ, কলেজের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি—যেগুলি আমাদের শিক্ষাজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—সেগুলির সমাধানের চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ, দেশের বৃহত্তম ছাত্রসমাজের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম ক'রে দিয়ে প্রয়োজনমত ছাত্রজীবনের সমস্যাবলীর সমাধানের চেষ্টা। এই নীতি অনুযায়ী যতগুলি কাজ সফল করতে পেরেছি সমস্তই আমার প্রিয় ছাত্রবন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনের সমস্ত কাজেও আগামী ইউনিয়ন ছাত্রবন্ধুদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবে আশা রাখি।

কলেজে ভর্তি সমস্যা

১৯৫৭ সালে বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে 'আসনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীম' প্রবর্তিত হয়। যে সব ছাত্রের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা আছে তারাই কেবল কলেজে আসবে প্রধানতঃ

আমরা মনে করি। সে রস স্বাদু না বিস্বাদ তার বিচারের ভারও আমরা বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের ওপর ছেড়ে দিলাম।

প্রবন্ধ অনেক পেয়েছিলাম—বাংলা এবং ইংরেজী দুই-ই। প্রকাশও করেছি অনেকগুলি, কিন্তু সবগুলিকে স্থান দেওয়া যায় নি। কারণ দু'টি—একটি স্থানাভাব, দ্বিতীয়টি বিলম্বে প্রাপ্তি।

* * *

সম্প্রতি সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বিচার নিয়ে বেশ একটু সোরগোল চলছে। দু'-পক্ষই যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে চাইছেন যে তাঁদের পথই ঠিক পথ। যাঁদের বিরুদ্ধে অশ্লীল সাহিত্য রচনার অভিযোগ তাঁদের যুক্তি—সাহিত্য হচ্ছে সমাজদর্শন। সমাজের চারিত্রিক অবনতি ঘটলে তাকে উপন্যাসে প্রতিফলিত করতে হবেই। সমাজে যা ঘটছে সেদিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে উটপাখির মত মাথা গুঁজে থাকলেই তো তা থেমে থাকবে না! এঁদের মতে যা বাস্তব, যা সত্যি ঘটছে, তাই হবে সাহিত্যের উপাদান। অপর দিকে যাঁরা এই সব রচনার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলছেন তাঁদের বক্তব্য—সাহিত্য হবে সত্য, শিব এবং সুন্দর। যা সত্য তাই সব সময়ে সাহিত্য হতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে—ঘটছে—যার মত সত্য আর নেই, কিন্তু তাই বলেই তাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া যায় না, কেন-না তা সুন্দর নয়। শিবকে বর্জন করলেও সুন্দরকে বর্জন ক'রে কখনও সাহিত্য-সৃষ্টি হতে পারে না। আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিক সমাজের যে চিত্র আঁকছেন তাই শুধু আমাদের বর্তমান সমাজের সঠিক চিত্র নয়। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক ভগ্নাংশ দিয়ে সমস্ত সমাজের বিচার করা যায়-না। সুতরাং সমাজের শুধু ঐদিকটুকু নিয়েই সাহিত্য-সৃষ্টির যে প্রবণতা আজ দেখা দিয়েছে তাকে নির্মমভাবে বাধা দিতে হবে এই হচ্ছে এঁদের মত। তা ছাড়া, এঁরা বলেন, সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বও আর পাঁচজনের মতই সাহিত্যিকেরও। সমাজকে—বিশেষতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের—নীতিভ্রষ্ট করার অধিকার সাহিত্যিকের নেই। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে সমাজের সঠিক চিত্র আঁকার নাম নিয়ে অর্থসঞ্চয়ের সহজ পথ হিসেবেই কতিপয় সাহিত্যিক এই আপত্তিকর পথে অগ্রসর হয়েছেন, আর শস্তা হাততালির লোভে আর একদল তাঁদের অনুকরণে মেতেছেন।

সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে বিরোধ আজকের নয়। এক যুগের পাঠকরা যা নিয়ে হৈ-চৈ করেছেন, পরবর্তী যুগের পাঠকরা তা মেনে নিয়েছেন। কাজেই এ বিষয়ে তর্ক কোন যুগেই থামবে বলে মনে হয় না। আসল কথা যে সাহিত্য সৃষ্ট হ'ল তা রসোত্তীর্ণ কিনা—সত্যকার সাহিত্য হ'ল কিনা সেটাই দেখতে হবে। বিদগ্ধ পাঠক সর্বদাই সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সাহিত্যের বিচার করবেন এইটাই কাম্য। যা

যথেষ্ট উন্নতি করতে পেরেছি। এবার চীপ স্টোর্সের নূতন ঘরের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চীপ স্টোর্সের সম্প্রসারণও করতে পেরেছি।

কমন রুম

কমন রুমে আরও তিনটি (সবশুদ্ধ পাচটি) ক্যারমবোর্ড এবং আরও একটি (সবশুদ্ধ দুইটি) টেবিল-টেনিস্ বোর্ডের ব্যবস্থা করতে পেরেছি এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় দোতলার হলের ব্যাল্‌কনিটিতে খেলার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। (পুজোর ছুটির পরে ওখানে খেলাধুলার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু বার্ষিক উৎসব, ইউনিয়ন নির্বাচন এবং বাইরে ও ভিতরে নানা আন্দোলন ইত্যাদির ফলে ঐগুলি অব্যবহৃতভাবেই পড়ে আছে। আশা করি ছাত্রবন্ধুরা এবার থেকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন।) এবং এ ছাড়া এবার কমন রুমে আমরা অনেক প্রচেষ্টার ফলে পূর্বে ব্যয়-না-করা সঞ্চিত অর্থ থেকে ১০০০৲ টাকার বই কেনারও ব্যবস্থা করেছি।

চীপ ক্যান্টিন

চীপ ক্যান্টিন এবছর এখনও পর্যন্ত বন্ধ না হ'য়ে মোটামুটি ভালভাবেই চলছে। তবে দিবা-প্রাতঃ-নৈশ—তিন বিভাগে একত্রিতভাবে ক্যান্টিন না চলার ফলে ক্যান্টিনকে আরও ভাল করা সম্ভব হয় নি। আশা করছি—আগামী ইউনিয়ন ক্যান্টিনকে সুন্দরতর করতে সক্ষম হবে।

ক্রীড়া বিভাগ

ইন্টার-ক্লাস ফুটবল লীগ ॥ ক্রীড়া বিভাগেও এবছর আমরা যথেষ্ট উন্নতি সাধন করতে পেরেছি। বহিরাগত খেলোয়াড়দের পরিবর্তে কলেজের খেলোয়াড়দের দিয়ে সমস্ত খেলা চালানোর জন্য এবছর আমরা ইন্টার-ক্লাস ফুটবল লীগ-এর ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

স্টেট্‌স্‌ম্যান ট্রফি ॥ এ বছর আমরা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত খেলাধুলায় সর্বাপেক্ষা বেশি পয়েন্ট অর্জনের ফলে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান ট্রফি' লাভের সম্মান অর্জন করেছি।

হকি চ্যাম্পিয়ন ॥ এবছর আমরা হকি লীগে লীগ-চ্যাম্পিয়ান হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

বার্ষিক স্পোর্টস ॥ প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ৮ই ও ৯ই ফেব্রুআরি আমাদের কলেজ-মাঠে কলেজের 'বার্ষিক স্পোর্টস' বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট খ্যাতনামা ক্রিকেট ক্রীড়াবিদ্ শ্রীকার্তিক বসু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মাঠেই পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠান হয়।

এ বছরও আমরা হেরম্বচন্দ্র শীল্ড ও ইলিয়ট শীল্ডের খেলায় যোগদান করি।

এবারে সাহিত্যে আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর "তপস্বী ও তরঙ্গিণী" নাটকটির জন্য। তাঁকেও আমরা এই সুযোগে অভিনন্দন জানাই। অভিনয়ের জন্য এবারে আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন প্রখ্যাত গায়ক ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত সবিতাব্রত দত্ত। তিনি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তাই তাঁর সাফল্যে আমরা বিশেষ আনন্দিত। প্রসঙ্গক্রমে বলি, তাঁর সঙ্গে একটি বিশেষ "সাক্ষাৎকারে"র বিবরণ এবারের পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল।

পরিণত বয়সে প্রবীণ কবি কালিদাস রায় কবিশেখরের রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্তিও উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন। উত্তর-বঙ্গের আদিবাসীদের সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিখে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সান্যালও এ বছর রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি পুরস্কারের কথাও এখানে আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করছি। সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য এ বছরের ভুবনেশ্বরী পদক। এটি পেয়েছেন রামধনু-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। ইনি আমাদের কলেজেরই রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং এই কলেজ পত্রিকার বর্তমান পত্রিকাধ্যক্ষ।

* * *

বিশ্বসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হচ্ছেন রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কী—যাঁর রচনা দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে মানুষের হৃদয়ে একটি শাশ্বত আসন দখল ক'রে আছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মা' দেশে দেশে তরুণদের প্রাণে বিপ্লবের মন্ত্র যুগিয়েছে, আর তাঁর নিজের দেশের পট-পরিবর্তনে তাঁর রচনার ভূমিকা তো অনস্বীকার্য! এ-বছর সারা বিশ্বে গোর্কীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হ'ল। রবীন্দ্র-পাঠচক্রের উদ্যোগে আমাদের কলেজেও বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

আর একটি বিশ্বখ্যাত মহীয়সী মহিলার জন্মশতবার্ষিকীও সম্প্রতি পালিত হয়েছে। ইনি রেডিয়াম-আবিষ্কারকর্ত্রী বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী মাদাম্ কুরী। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিভাধর পুরুষের পাশে অনুরূপ প্রতিভাশালিনী মহিলার নাম অল্পই খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্যে যদি-বা কিছু চোখে পড়ে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা প্রায় দুর্লভ বলা চলে। কিন্তু ব্যতিক্রম সর্বত্রই আছে এবং বিজ্ঞান-জগতেও এই শূন্যতা অনেকটা একাই পূর্ণ করেছিলেন একটি মহিলা। তিনি মাদাম্ কুরী। বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু মাদাম্ কুরী দু'-দু'-বার এই সম্মানের অধিকারিণী হয়েছিলেন—একবার যুক্তভাবে পদার্থবিজ্ঞানে, আর একবার এককভাবে রসায়ন-শাস্ত্রে। জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

* * *

অন্যান্য উৎসব ॥ প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নির্দিষ্ট তারিখগুলিতে আমাদের প্রিয়তম নেতাজী জন্মোৎসব, প্রজাতন্ত্র দিবস ও সরস্বতীপূজা উৎসব পালিত হয়।

সারা বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ॥ এবছর আমরা 'সারা বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করি। বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ক'রে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

শিল্পপ্রদর্শনী ॥ এ বছর শিল্পকলা সম্পর্কেও ছাত্রবন্ধুদের প্রতিভার বিকাশের জন্য তিনদিনব্যাপী এক শিল্পপ্রদর্শনীর অয়োজন করা হয়। কলেজের ছাত্রদের নিয়ে এই শিল্পপ্রদর্শনী কলেজ হলে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পেইন্টিং, মডেলিং, হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট্‌স্ ও মডার্ন আর্ট—প্রত্যেকটি বিভাগে একটি ক'রে পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিতর্ক বিভাগ

এবছর কলেজে ছাত্রদের বিতর্ক মানের উন্নয়নের জন্য 'বিতর্ক পরিষদ্' গঠন করা হয়েছে। বিতর্ক পরিষদের চারটি অধিবেশন হয়েছে। এবছর কলেজে 'সারা বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতা'ও অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ থেকে বহু ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাইরের বহু প্রতিযোগিতায়ও আমাদের কলেজ থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান ক'রে কলেজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কথাও বলতে হচ্ছে। এবারকার ছাত্রসংসদ্ নির্বাচনে কিছু বিপথগামী ছাত্র কলেজের ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি, যার প্রকাশ পেয়েছে কলেজ-অভ্যন্তরে বোমা বিস্ফোরণে। পবিত্র শিক্ষামন্দিরে এ ধরনের ঘটনা অভাবনীয় বলা যেতে পারে। ছাত্রসংসদ্ এবং কলেজের প্রতিটি শুভানুধ্যায়ীই এই ব্যাপারের তীব্র নিন্দা করেছেন। সম্পাদক হিসাবে আমিও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং ভবিষ্যতে যাতে ছাত্রসমাজের শুভবুদ্ধি এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পারে তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

পরিশেষে

সংসদের বিগত কয়েক মাসের ইতিহাস শেষ করার পরে দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, যে, ইচ্ছা থাকলেও সময়াভাব ও বহুবিধ অসুবিধার জন্য আরও অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আগামী ইউনিয়ন নূতন উদ্যমে তা শুরু করবে এ ভরসা নিশ্চয়ই করব। তবে উক্ত কার্যসমূহ সমাধান করতে যাঁদের স্নেহাশিস্ আমাদের পেছনে ছিল তাঁদের মধ্যে আছেন আমাদের ইউনিয়নের সভাপতি-শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপতি-রঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীরদকুমার ভট্টাচার্য, উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন ও আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ। এ ছাড়া আমার সহকর্মী সমস্ত

দিয়েই এটিকে সাজানো হয়েছে। পাঠকরা সেদিক্ দিয়েই এর গুণাগুণ বিচার করবেন বলে আমরা আশা করি। যে স্বল্পসংখ্যক অধ্যাপক তাঁদের রচনা দিয়ে পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন তাঁদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক অজিতকৃষ্ণ বসু (সাহিত্যক্ষেত্রে অ-ক্ল-ব নামে পরিচিত), অধ্যাপক অসিতকুমার রায়, অধ্যাপক অজয়কুমার সেন, অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিশ্বমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ ছাড়া কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত—তাঁদের রচনা প্রকাশের সুযোগ দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। এঁদের মধ্যে খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত দিনেশ দাসের কথা আগে মনে পড়ছে। ইনি ১৯৩০-৩২ সালে এই কলেজের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু এখনও কলেজের প্রতি প্রীতির বাঁধন তাঁর অক্ষুণ্ণ আছে।

পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে যাঁর সাহায্য বিশেষভাবে পেয়েছি তিনি হচ্ছেন পত্রিকাধ্যক্ষ, অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করব না। আর কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। তিনি সুসাহিত্যিক ও আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। অল্প সময়ের মধ্যে কলেজ পত্রিকাটিকে সুমুদ্রিত অবস্থায় পাঠকসমাজের হাতে পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব তাঁরই।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
রণদেব সরকার

প্রতিবেদন

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি এবছর কলেজের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীদেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন এবং আবৃত্তি বিভাগের সম্পাদক অজিত মুখোপাধ্যায় বালিগঞ্জ বিবেক-সাধনা সংঘের আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

সাহিত্যে আগ্রহী ছাত্রবন্ধুদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেয়েছিলাম বাৎসরিক সাহিত্য প্রতিযোগিতায়। ছোটগল্প, কবিতা, একাঙ্ক নাটক এবং প্রবন্ধে বিশিষ্ট স্থানাধিকারিগণকে বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

এবারে নাটকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন নাট্য বিভাগের সম্পাদক সুশীল ভট্টাচার্য। অনেকদিন পরে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত আন্তঃকলেজ নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক "বৃত্তে মানসী সোম" কোন পুরস্কার লাভ না করলেও বিচারকমণ্ডলী ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে নূতনত্বের আস্বাদ দিয়েছিল। এটি রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন সুশীল ভট্টাচার্য আর বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রণব চক্রবর্তী, জয়ন্ত ঘোষ, সুভাষ চক্রবর্তী এবং নাট্যকার স্বয়ং। এ ছাড়া 'নবীন বরণ উৎসবে' সুশীল ভট্টাচার্যের লেখা "একটি বৃত্তের শরীর ও ট্যান্টেলাস" অভিনয় করেন কলেজের ছাত্রেরা। এ বছরের 'নবীন বরণ' উৎসবে বাইরের প্রখ্যাত শিল্পীদের না এনে কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রদেরই সুযোগ দেওয়া হয়। এতে ছাত্রদের এবং অধ্যাপকবৃন্দের কাছ থেকে প্রচুর অভিনন্দন পাই।

সংগীত বিভাগের সম্পাদক পলাশ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন বিশিষ্ট সংগীত-শিল্পী। কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে তেমন সাড়া না পেলেও ইনি নিজেই কাজ করেছেন আপ্রাণ। কলেজে সংগীতচর্চার প্রসারে এঁর দান অস্বীকার করা কঠিন।

আর একটি আনন্দদায়ক খবর—এবারে তিনদিনব্যাপী এক "শিল্পপ্রদর্শনী"র ব্যবস্থা করা হয় কলেজ হলে। এতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন সুশীল ভট্টাচার্য, কালীপদ নন্দী, বিকাশ চক্রবর্তী, সুব্রত ভদ্র এবং অজয় গঙ্গোপাধ্যায়।

মহাজাতি সদনে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে আমাদের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রখ্যাত অভিনেতা মৃণাল মুখোপাধ্যায় ("ছুটী"তে অভিনয় ক'রে যিনি খ্যাতিলাভ করেছেন)। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশ্যামল মিত্র, শ্রীযোগেশ দত্ত, শ্রীহিমাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়, শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী, শ্রীজিতেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সাংস্কৃতিক বিভাগের উন্নতিসাধনে যাঁদের সক্রিয় সাহায্য পেয়েছি, তাঁরা হলেন

ASUTOSH COLLEGE ROWING TEAM

Winner—Inter College League Regatta 1967

Winner—Inter College Knock-out Regatta 1967

Standing (L to R)—G. Mahato (Mali), S. Bhattacharya (Games Secy.), G. Bose (Captain), T. Chatterjee, P. Chakrabarty, A. Banerjee and another.

Sitting (L to R)—Prof. R. Ghosh (Prof.-in-charge, Sports), Prof. B. Bhattacharya (Prof.-in-charge, Hockey), Prof. P. Roy (Prof.-in-charge, Rowing), Vice-Principal P. Sen, Principal N. K. Bhattacharjee, Prof. B. Chakrabarty (Prof.-in-charge, Games), Prof. B. Bhattacharya (President, S. U.), Prof. P. Roychowdhury (Prof.-in-charge, Cricket)

প্রতিবেদন

ক্রীড়া-বিভাগ

ক্রীড়া-সম্পাদক হিসাবে ক্রীড়া-বিভাগের যতটা উন্নতি সাধনের ইচ্ছা আমার ছিল, ঠিক ততটা সফল আমি নিশ্চয়ই হই নি, তবে বিদায়ী সম্পাদক হিসাবে আমি শুধু এই আবেদন জানাব যেন কেবলমাত্র আমার সাফল্যটুকু দিয়েই আমার প্রচেষ্টার পরিমাণ অনুমিত না হয়।

ক্রীড়া-সম্পাদক হিসাবে আমার গত দু-বছরের কার্যকালে আশুতোষ কলেজের ক্রীড়া-বিভাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে তা শুধু আমার নয়—সকল ছাত্রেরই একান্ত গর্বের বিষয়। বিগত পাঁচ বছরের মত এবছরেও আমরা রোইং চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছি। বিশেষতঃ ১৯৬৭ সালে রোইং-এ আমরা নক্-আউট্ এবং লীগ দুটিতেই বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছি।

এবারে আন্তঃকলেজ হকি লীগ প্রতিযোগিতায় আমরা চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছি এবং এস্. আর. দাশগুপ্ত কাপ প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছি।

আশুতোষ কলেজের খেলাধূলার ইতিহাসে এবছরটি স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে আরও একটি কারণে। সেটি হচ্ছে, এ বছর সবচেয়ে বেশী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ক'রে সবচেয়ে বেশী পয়েণ্ট পাবার ফলে আমরা সর্বপ্রথম স্টেট্স্ম্যান্ ট্রফী লাভ করেছি। আন্তঃকলেজ ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতির এ এক গৌরবময় স্বাক্ষর সন্দেহ নেই।

গত দু'বছর আন্তঃকলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনাল্ পর্যন্ত উঠেও সামান্য সংখ্যক রানের ব্যবধানে আমাদের পরাজয় বরণ করতে হয়। আমাদের পক্ষে ক্রীড়া-নৈপুণ্যের অভাব ঘটে নি—এটা নিতান্তই ভাগ্য-বিপর্যয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, এই বছরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আমাদের কলেজের দু'জন ছাত্র অংশ গ্রহণ ক'রে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এঁরা হলেন শ্রীস্বপন দে ও শ্রীসুখেন্দু পাঠক।

ফুটবলের ক্ষেত্রে এবছর আমরা কিছু নূতনত্বের সৃষ্টি করেছি। এ বছরই প্রথম কলেজে আন্তঃশ্রেণী ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্ হবার গৌরব লাভ করল তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সাহিত্য বিভাগ এবং রানার্স-আপ হবার গৌরব পেল তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগ।

ক্রীড়া-সম্পাদক হিসাবে একটা কথা আমার বারবার মনে হয়েছে—ক্রীড়াক্ষেত্রে ছাত্রদের সমস্ত উদ্দীপনাকে স্তিমিত করার পক্ষে সম্ভবতঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বিভাগটিই দায়ী। এঁদের উৎসাহের অভাবে গত দু'বছর ধরে আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতাটি সমাপ্ত হচ্ছে না। এবছর ফুটবলে আমরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন্ হলেও

the lockers with these artificial keys. He tries to learn the processes, study the complexities and expose the secrets of nature in order that man can exploit nature for his own interest. It is just like the work of a detective engaged on unravelling a plot. Therefore data, facts and clues are all the more necessary materials for him to enable him to solve geological problems. Theories are often logically developed by a geologist so as to fit the collected data and naturally a theory can be thrown away to the waste paper-basket as soon as it fails to explain the observed facts.

Geology is a modern successor of the natural science of the 18th and 19th centuries. It was in the habit of the natural scientists to describe in detail the odd things that they found in nature. Early naturalists made many important observations which in later times served to build up the modern science. One of these observations was about the geometry of crystals. Early naturalists wrote down detailed descriptions of the crystals found by them recording carefully the values of all the angles between the faces of a crystal. It was a very tedious job and apparently a useless hobby in those days. It was during the course of such measurements that they noticed the special angular relationship between the faces of a crystal. These observations led them to conclude that crystals are made up of 'building blocks'. Let us now study an example, one like those which led the naturalisls to derive the idea of building blocks for crystals. The figure in the next page (Fig. I) is the drawing of a crystal of zircon, the chemical composition of which is zirconium silicate which contains about 32·8% silica and 67·2% zirconium oxide together with a little iron oxide. The chemical formula is $ZrSiO_4$. A natural crystal of zircon always crystallizes in the tetragonal system with the form shown in the figure. The mineral is used as a gem-stone and also as a source of zirconium oxide.

On a crystal of zircon the angle between the vertical face *m* and the inclined face *u* is 20°12½′ and the angle between the same vertical face *m* and the inclined face *p* is 47°50′. These angular relations are found to be constant in all measurements.

Now the tangent of 20°12½′ is 0·36804 and the tangent of 47°50′ is 1·1041 or 3×0·36804. How can we explain that these tan values are mutually related by a whole number multiple ?

Abbé René Just Haüy (pronounced as Howie), a French man born in Paris in 1743, started his career as a botanist and later became a crystallographer. He first tried with this problem and published his papers in 1784 enunciating the whole number relation-

কলেজের দু'জন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীচিত্ত রায় ও শ্রীপ্রবোধ পুরকায়েত গত সাধারণ নির্বাচনে যথাক্রমে এম. পি. ও এম. এল. এ. নির্বাচিত হন। উভয়ের এক সংবর্ধনা-সভায় শ্রীচিত্ত রায়কে ভাষণ দিতে দেখা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য।

আশুতোষ কলেজ হকি টীম

বিজয়ী—আন্তঃকলেজ লীগ প্রতিযোগিতা ১৯৬৭-৬৮

রানার্স-আপ—আন্তঃকলেজ নক আউট প্রতিযোগিতা (ডঃ এস. আর. দাশগুপ্ত কাপ) ১৯৬৭-৬৮

দাঁড়িয়ে (বাঁ দিক থেকে)—এস. ভট্টাচার্য (ক্রীড়া সম্পাদক), বি. সিং, এম. ঘোষ, এ. বসু, এস. মিত্র (ক্যাপ্টেন), এইচ. সিং, অধ্যাপক বি. ভট্টাচার্য (ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, হকি), এ. পালিত, আই. মিত্র, পি. মুখার্জি, বি. রায়চৌধুরী, এ. কুণ্ডু, এস. দাস।

বসে (বাঁ দিক থেকে)—সি. বসাক, জে. ঘোষ, এ. চ্যাটার্জী, পি. গুহ, এন. সিং।

If the width of the stack be increased 4, 5 or 6 times in every layer keeping the number of layers constant in all arrangements, the tangent values of the angle between the vertical plane and the inclined board placed against the edges of the building blocks will be $4\times0{\cdot}36804$, $5\times0{\cdot}36804$ and $6\times0{\cdot}36804$ respectively, corresponding to which the angles will be 55°49′, 61°29′ and 65°38½′ respectively. Therefore, faces making these angles with the vertical face *m* can possibly develop one after another at the top and the bottom of the zircon crystal. This whole number relationship between the tangent values of the interfacial angles of crystals convinced the early naturalists that crystals are made up of building blocks.

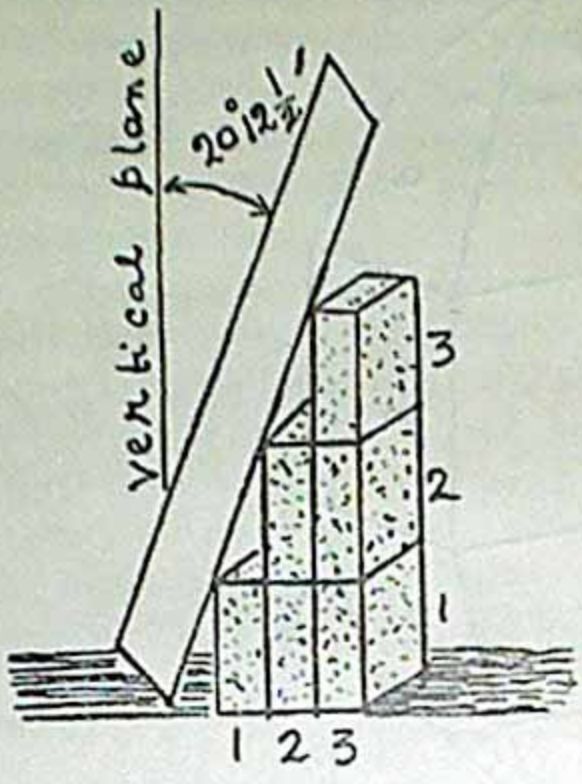

Fig. 2

Still Abbé Haüy was very much disheartened as he could not detect the edges of the building blocks at the faces of crystals. Even with the most powerful microscope these blocks could not be found.

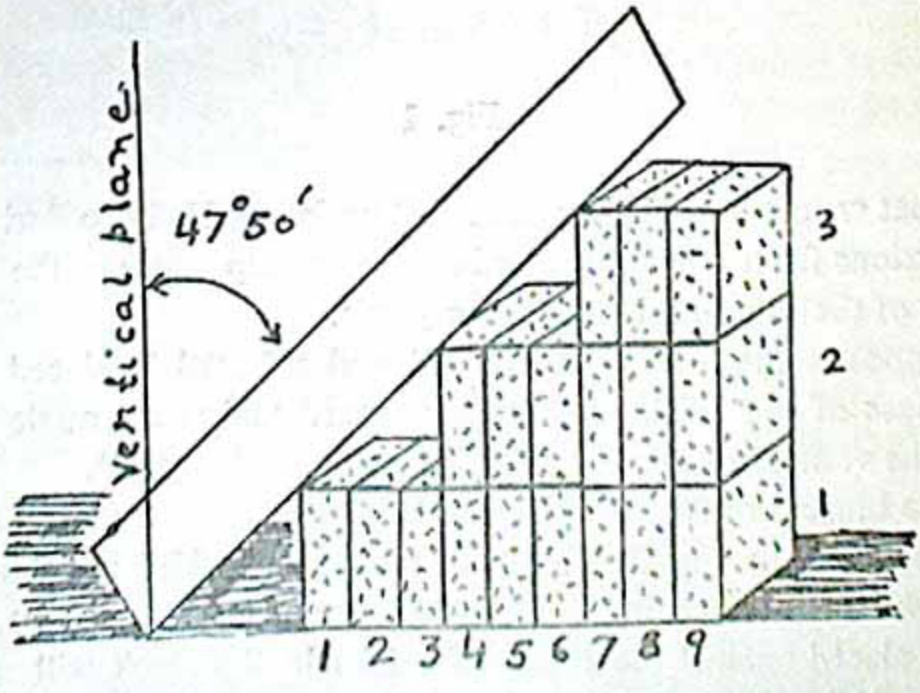

Fig. 3

প্রতিবেদন

রসায়ন পরিষদ্

বহুদিন বন্ধ থাকার পর গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানতঃ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভূপতিরঞ্জন ভট্টাচার্যের উৎসাহে আবার আশুতোষ কলেজ রসায়ন পরিষদ্ নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সভাপতি, সহ-সভাপতি ও প্রধান সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন যথাক্রমে অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুবীর বসু রায় ও অধ্যাপক বিমলচন্দ্র বেরা। আমাদের দু'জনের উপর যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

একটি মাসিক প্রাচীর-পত্রিকার মধ্য দিয়ে আমরা প্রথমে রসায়ন পরিষদের কাজ শুরু করি। এ পর্যন্ত মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ক্রমশঃ পত্রিকার মান ও আঙ্গিক উন্নত করার চেষ্টা করেছি। পত্রিকার ব্যাপারে ছাত্রবন্ধুদেরও ক্রমবর্ধমান উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। সেমিনার ও একটি বিজ্ঞান-প্রদর্শনী করারও আমাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য তা হ'য়ে ওঠে নি। অদূর ভবিষ্যতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য একটি রসায়ন-পাঠাগার ও রসায়ন-সম্মেলন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা আমাদের আছে। প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থাও আছে এই পরিকল্পনায়।

আমাদের প্রধান সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিমলচন্দ্র বেরাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করব না। তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই শিল্পী তপন সরকারকে, যিনি অপূর্ব দক্ষতায় প্রতিবার পত্রিকার অঙ্গসজ্জা ক'রে দিয়েছেন।

এবার আমাদের বিদায়ের শঙ্খ বেজেছে। যাঁরা আমাদের পরে যুগ্ম-সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব বহন করবেন তাঁদের সাফল্য কামনা ক'রে আজ এইখানেই বক্তব্য শেষ করছি।

অশেষ রায়
নরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
যুগ্ম-সম্পাদক

বিতর্ক-পরিষদ্

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর কলেজে অধিকতর সংগঠিতভাবে বিতর্ক পরিচালনার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হওয়া যায় নি বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য,—যার মধ্যে প্রধান হ'ল সীমিত সময়। পুজোর ছুটির আগে মাত্র দেড়মাসের মত সময় পাওয়া গিয়েছিল। পুজোর পরে দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য কলেজ বেশ

searching for a truth. However trifle and insignificant a phenomenon may be, it must be observed carefully from all angles, from all sides, and the observations should be faithfully recorded. Who can say now where will they lead to ?

It is undoubtedly true that observations must be interpreted and theories have to be built. Though data can change a theory, no theory can change the data. To a geologist theories are man-made ideas about nature but the earth is the very basis of human existence. So he sets his feet firmly on the earth to build up theories and never tries to stand on a theory to create an earth.

WHY OUR PLANS HAVE FAILED

PARTHA SARATHI MAZUMDAR
First Year, B. A. Class

THE above headline is perhaps the most controversial topic of today. However impressive the official statistics may be about the achievement of the plan, the fact remains that the basic aim of planning, namely, increasing the standard of living of the common men, is still a long way off. The question may pertinently be asked whether our plans have failed and, if so, in what respect and to what extent ?

There are different opinions on the subject. According to one section, there is a basic defect in our economy as the entire economy is not under any strict control. The economy is divided into two zones, namely, the controlled public sector and the private sector which is more or less free. Thus the twin existence of the public sector and the private sector has converted our system only into a mixed economy instead of developing a socialist pattern. The private sector is divided into two groups : (i) Organised and (ii) Unorganised. Unorganised private sector comprises of small-scale industries and agriculture. Production plan for the unorganised sector has been done more or less on a hypothetical basis without any detailed study or adoption of proper statistical method and also without any control. Public sector depends on private sector for raw materials and hence the planned target of the public sector is under the influence of the unorganised

প্রতিবেদন

নূতন ছাত্রাবাস

২৬শে জানুআরি তারিখটি আমাদের মুক্তির আলোর সন্ধান দিয়েছিল। আমাদের ছাত্রাবাসে এই দিনটিকে আমরা যথাযোগ্যভাবে পালন করবার চেষ্টা করেছি আর তার তিন দিন আগে ২৩শে জানুআরি পালন করেছি প্রিয় নেতাজীর জন্মদিনটিকে। ছাত্রাবাসের মন্থর জীবনযাত্রায় এ দু'টি দিনই যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। তেমনি উদ্দীপনা নিয়েই ছাত্রাবাসের বন্ধুরা ভারতীর চরণে অঞ্জলি দিয়েছে। এবারকার সরস্বতীপূজায় আনন্দ-উৎসবের অভাব ঘটে নি আমাদের।

আমাদের ছাত্রাবাসের আবাসিকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলও আশানুরূপ বলা যেতে পারে। শুধু পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখানো নয়, এখানকার ছাত্রেরা জীবনের আরও নানা ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের আবাসিক বন্ধু শ্রীব্রজেন কুমার মুখার্জির কথা স্বভাবতঃই মনে আসছে। ইনি একজন উদীয়মান ও প্রতিভাধর নৃত্যশিল্পী। এবারের অনুষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ইনি নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ছাত্রাবাস এবং সেই সঙ্গে কলেজেরও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

ছাত্রাবাসের গ্রন্থাগারটির সংস্কার আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ। এর প্রধান কৃতিত্ব গ্রন্থাগারিক শ্রীগৌতমবুদ্ধ রায় দাবী করতে পারেন। তিনিই প্রথম ত্রৈমাসিক গ্রন্থাগার চার্জ সংগ্রহের ব্যবস্থা ক'রে গ্রন্থাগারটির আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের ক্রীড়া-সম্পাদক শ্রীসুকুমার নাথকে। এঁরই চেষ্টায় খেলাধুলার ক্ষেত্রেও আমরা যথেষ্ট এগিয়ে আসতে পেরেছি।

পরিশেষে ছাত্রাবাসের নানা উন্নয়নের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় অধীক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত শিবরাম ভট্টাচার্য মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শান্তস্বভাব, ছাত্রদরদী এই মানুষটির স্নেহমমতা আমাদের প্রবাস-জীবনের শূন্যতা অনেকখানি ভরিয়ে দিয়েছে।

পৃথ্বীপতি পণ্ডা
সাধারণ সম্পাদক

পুরাতন ছাত্রাবাস

একটা বছর অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল। কালের ইতিহাসের কাছে হয়তো একটা বছর কিছুই নয়—তবুও নানা ঘটনাস্রোতে ছাত্রাবাসের আবাসিকবৃন্দের কাছে এবছরটি স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

এই উপলক্ষে ছাত্রাবাসের সুসংবদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের কথা মনে আসছে। এঁর সুষ্ঠু সমাপ্তি সকলকেই খুশী করবে। সম্পাদক হিসাবে ছাত্রাবাসের সমস্ত ব্যাপারে

shape to it, the system can never succeed. Thus, unless the whole population can be sufficiently enthused no plan can succeed. The only way to enthuse the people or the whole nation is to uphold before them a proper ideology.

Next comes the defect of unbalanced growth. There is an input-output relation between all the industries. For the economic development, all the branches of the industry are to be developed simultaneously in a balanced manner. Our planners gave priority to some specific industries at the cost of other industries and thus could not properly strike a balanced growth.

Too much dependence on foreign aid also prevented us from being self-reliant. Foreign aid up to a stage is necessary but beyond that it may be a burden. A developing country should try to be self-reliant as quickly as possible. But in our case the foreign aid (loan) is mounting up with each plan and our plan is more or less foreign aid (loan) based.

The aid (loan) amounted to Rs. 64·8 crores in the First Plan, Rs. 201·6 crores in the Second Plan and Rs. 2,880·3 crores in the Third Plan—a total of Rs. 4,515·1 crores over the three Plan period at an increasing rate.

Preparation of plans without adequate statistical information is another reason for the failure of our plans. Our plans are made more or less on a hypothetical basis. While executing the plans conflicts had arisen between the theories of the plan and the practical problems involved.

Next is the case of improper use of foreign capital. Foreign capital is of course necessary for the developing countries for their economic development but not to an unlimited extent. Too much dependence on foreign capital brings frustration among the indigenous industries and skills. Foreign enterprises with adequate capital dominates over all industries and makes a monopoly over the market. It is to be borne in mind that foreign capital should be accepted without any political ties. Our Govt. directly makes no political tie but the donner country (particularly U.S.A.) forces India to come under a political tie. Foreign capital should be invested in the capital goods industry so that the country's economic growth may get an accelerated tempo. But in our country investments are being made in all the spheres of economy instead of investment of foreign capital in capital goods industry. So in spite of the presence of foreign capital, our economy is not developing at an accelerated rate. Foreign capital is to be invested only for the productive purpose, but India is not following that course.

প্রতিবেদন

ছাত্রদের এইড্ ফাণ্ড-এর জন্য আলাদা কোন ফাণ্ড আমাদের কলেজে নেই। জেনারেল ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা কেটে যে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় ছাত্রদের জন্য তা মোটেই যথেষ্ট নয়। ঐ ব্যাপারে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং আশা করি আগামী বছরের সম্পাদক এ ব্যাপারে চেষ্টা করবেন। ছাত্রদের জন্য জেনারেল ফাণ্ড ছাড়াও আলাদা ক'রে এইড্ ফাণ্ড-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন মনে করি।

তপন চক্রবর্তী
সম্পাদক

চীপ্ স্টোর

বর্তমান বৎসরের ছাত্র-সংসদের চীপ্ স্টোর সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হওয়ার পর চীপ্ স্টোরকে উন্নত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে কতটা সফলকাম হয়েছি তা বিচার করবেন ছাত্রবন্ধুরা।

বহুদিন থেকেই চীপ্ স্টোর-এর জন্য আলাদা একটা ঘর না থাকায় ছাত্রবন্ধুরা বহু অসুবিধা ভোগ করছিলেন এবং ছাত্র-সংসদের অফিসে চীপ্ স্টোর থাকার জন্য ছাত্র-সংসদের কাজেরও বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তাই এবার আমি প্রথমেই চীপ্ স্টোরের জন্য আলাদা একটা ঘর ক'রে সেখানে চীপ্ স্টোরকে স্থানান্তরিত করি।

বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে শস্তায় কোন কিছু সরবরাহ করা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। এবার আমি তবু যতদূর সম্ভব শস্তায় বই, কাগজপত্র, ল্যাবরেটরীর জন্য রো-পাইপ, প্ল্যাটিনাম ওয়ার ও প্র্যাক্টিক্যাল নোটবুক্ সরবরাহ করতে পেরেছি।

অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কার্যভার নিয়েছিলাম—কিছুটা সফলকাম হওয়ায় আনন্দলাভ করেছি।

যে কয়জন ছাত্রবন্ধু বিশেষভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক শ্রীকার্ত্তিক সাহা, সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রীপবিত্র দে সরকার, শ্রীদীপক সাহা, শ্রীবাবুল বসু ও শ্রীঅশোক সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদায়ের আগে আগামী দিনের সম্পাদককে আমি যে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি নি সেই কাজ করবার অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মৃণাল বসু
সম্পাদক

It can also be said that whatever we may do for the success of the plan it is sure that nothing can be totally cured with the present pattern of our economy. Socialisation of the economy can only cure all the problems which can only be achieved by revolution, i. e. Socialist Revolution !

PUZZLES OF THE UNIVERSE

SWAPAN KRISHNA MAJUMDAR
Third Year, B. Sc. Class

IN this article I would like to present you with some things which seem to be puzzling at first sight. But they would no more remain puzzles when the scientific backgrounds behind them are made clear.

Thus you will most probably be surprised when I say that you may have a night-sky at day time, or that your younger brother becomes sixty years old in two years.

You will all the more be astonished when I say that a strong man or even an elephant is not able to lift a spoonful of a material, or that your fountain-pen is floating in the air around you, or that you see the sunrise before actually the sun rises. I would try to discuss such things. Thus this article is neither an imaginary bed time story nor a science fiction, but it is rather a science article.

Density of a material :

You know that the mass of a body is the quantity of matter containd in it. Now the mass per unit volume is called density. Scientists can measure the density of stars. The star 'PUP' is of such an average density that one cubic centimetre of its material weighs nearly 50 kilograms. Again, there are more dense stars in the universe. Scientists say that the density of the "star number 8247 in the Astrographic catalogue 70°N declinatian" is 36,000 kilograms per cubic centimetre. *Thus if a spoonful of its material is brought to earth, it will weigh as much as a steam engine!* On the other hand, there are such stars whose density is less than that of the ordinary vacuums produced in the laboratories.

গ্রন্থ-আলোচনা

বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত-রত্নাকর (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ ; ৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা-৩৪। মূল্য প্রতি খণ্ড ছয় টাকা।

ভবিষ্যতের মনোরম স্বপ্ন দেখে মানুষ। ভবিষ্যতের কল্পনায় রঙীন হ'য়ে ওঠে যে মন, সে মনের পটভূমিতে রয়েছে বর্তমান এবং অতীত। অতীতের ঐতিহ্যবাহী যে সমাজ, সে সমাজের গৌরবের ইতিহাস আছে, সেই গর্বে সে বর্তমানের দ্বিধাদ্বন্দ্বকে কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার প্রেরণা পায়। এ সত্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে যতখানি প্রযোজ্য, তেমনি জাতির ক্ষেত্রেও। তাই একটি জাতির সামগ্রিক পরিচয় তার বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল একটা জাতির পেছনে রয়েছে অতীত গৌরবগাথা। আমরা স্বাধীনতা-আন্দোলনে যে প্রেরণা পেয়েছি, বর্তমানের বেদনার কালো ছায়াকে যে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গেছি, তার কারণ অতীতের গৌরব-কাহিনী। তাই নিজেদের জানার ও উপলব্ধির প্রধান অঙ্গ হ'ল নিজেদের অতীতকে জানা।

গ্রাম-কেন্দ্রিক সভ্যতা এই ভারতবর্ষের। তাই গ্রামীণ সংস্কৃতি ও পরিচিতির মধ্যেই যথার্থ ভারতবর্ষের ইতিহাস আত্মগোপন ক'রে আছে। সে ইতিহাসকে আবেগমুক্ত, যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার ক'রে দেখার সময় এসেছে। সংস্কৃতির পরিচয় মুখ্যতঃ তার সাহিত্যে, শিল্পকলায় ও সঙ্গীতে। তাই গ্রামীণ সাহিত্য, যা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে স্পন্দিত ও প্রকাশমান—তার সঙ্গে পরিচিতিই যথার্থ সমাজ ও জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সে জন্য বাঙলাদেশকে যদি জানতে চাই, তার যথার্থ ক্ষেত্র বাঙলাদেশেরই গ্রামীণ সাহিত্য অর্থাৎ প্রচলিত সংজ্ঞায় লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে নিহিত।

আজ নতুন ক'রে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে জাতীয় আত্মোপলব্ধির। নানা ক্ষেত্রে তাই অতীতকে জানার একটা তাগিদ এসেছে। সেই আত্মোপলব্ধির সাধনায় যে-সব ক্ষেত্র প্রাধান্য পেয়েছে লোকসঙ্গীত তার মধ্যে অগ্রগণ্য।

আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, সম্প্রতি প্রকাশিত 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থের আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ এই অভিনব কোষগ্রন্থ নানাদিক্ দিয়ে উল্লেখযোগ্য। আভিধানিক রীতিতে এই চার খণ্ড

your mass and 'g' is the acceleration due to gravity equal to 32 ft./sec^2. Again, if you are in an elevator on earth having downward acceleration 'f' then your apparent weight will be $m(g-f)$.

Now, suppose you dive from a very high diving platform. You are falling with acceleration 'g'. Thus your apparent weight is $m(g-g) = 0$. So you will feel the weightless state. Thus we feel weightlessness when we respond fully to earth's pull of gravity.

An artificial satellite moving round the earth is always falling towards the earth with acceleration 'g_1' (the apparent value of gravity at that height). But because the earth surface is curved, the satellite cannot reach the earth surface though it goes on falling towards the earth. Thus it moves round the earth. So, if you are in a capsule orbiting the earth, you will feel weightlessness because you respond fully to the gravitational pull of the earth. *Now if you leave your fountain-pen in the air in front of you, it will be floating.* How interesting !

Time and Man :

When it is noon in India, it is night in America. Again, when it will be night in India, it will be noon in America. If you keep moving with the speed of earth's diurnal motion in an opposite direction, then you will always be at noon in whatever country you are and *you will never have a night in your life.*

Again, if the earth's time period of rotation about its axis were the same as that of its revolution around the sun, then one face of the earth would always face the sun and the other face would always remain dark. Thus if it were noon in India now, it would remain noon for all time and *England would perhaps be the land of eternal evening.*

Einstein said that we would get some peculiar results if we moved at a very high speed. Firstly, our *mass would increase with increasing speed.* Secondly, *the length of our measuring foot-scale would shrink in the direction of motion.* And thirdly *our clock would run slow.*

The third one gives us funny conclusions. In future we may have very long journeys with terrific speed in outer space. Now, let there be young twin brothers Ramu and Samu on the earth. If Ramu goes out on a very long trip and Samu stays on the earth, then Ramu's watch will run slow. When Ramu comes back after a few years according to his own watch, he may find Samu to be an old man, while Ramu will look still quite youthful. Again, just opposite may be the case. Really a paradox !

It is twentieth century on the earth now. There may be *a planet in the universe where there is now the age of those big pre-historic creatures.*

আভিধানিক রীতিতে বিধৃত। তার সঙ্গে পাই, লোকসঙ্গীতের সহযোগী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের চিত্র। এইসব বাদ্যযন্ত্র আজ নগরের নানা আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের প্রাদুর্ভাবে নিজের অস্তিত্বকে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারছে না। লোকসঙ্গীতের সুরারোপ বেতার-গ্রামোফোনের দৌলতে যে ভাবে কৃত্রিমতার মধ্যে তার প্রাণস্পন্দন হারিয়ে ফেলছে—সেই সব সুরের যথাযথ রূপটুকু, গ্রাম্য ঢঙ্‌টুকু বজায় রাখতে না পারলে তার সজীবতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। আশুতোষবাবু লোকসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে দিয়ে লোকসঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি এই খণ্ডে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি গানের সংক্ষিপ্ত স্বরলিপিও এই খণ্ডে পাওয়া যাবে। অবশ্য লোকসঙ্গীতের স্বরলিপি দেখে সেই গ্রামীণ অকৃত্রিম আমেজ আনা যাবে না—যদি না সেই জীবনের ভিজে মাটির গন্ধ গলায় লেগে থাকে। সিমেন্টের পালিশ-করা গলায় তা সম্ভব নয়।

আশুতোষবাবু ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন,—"(ইহাতে)···বাঙলার জন-জীবনের কতকগুলি অনাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহাতে দেখা যাইবে, দেশে সর্বব্যাপী নিরক্ষরতা সত্ত্বেও কি ভাবে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনী সর্বত্র বিস্তার-লাভ করিয়াছে। বাংলার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ভিন্নভাষাভাষী আদিবাসী সমাজেও কি ভাবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পুরাণ-কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে।···ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, বাংলার জনসাধারণকে আমরা নিরক্ষর মনে করিলেও মূর্খ মনে করিতে পারি না।···বাঙালীর ধর্মচিন্তার যে এক সূক্ষ্ম ধারা জন-মানসের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া বাঙালীর আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাও সংগৃহীত লোকসঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া উপলব্ধি করা যায়। বাঙলার সাধারণ জনগণের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে এই সকল অলিখিত উপকরণ কিছুতেই অবজ্ঞাত হইতে পারে না।" 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত-রত্নাকর' সেদিক্ দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। চার খণ্ডে বিভক্ত এই সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ বাঙলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় আশুতোষবাবু যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন, বাঙলা সাহিত্যরসিকের কাছে তা সবিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। গবেষকদের যে উচ্চ আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন, তা-ও প্রণিধানযোগ্য। বাঙলাদেশের মাটির যে ইতিবৃত্ত তিনি রচনা করেছেন তাঁর সাধনার দ্বারা, আমরা নিশ্চিত জানি, বাংলার মাটি তাঁর এই অবদানকে কোনও দিন ভুলবে না। ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে তিনি শুধু উদ্ধার করেন নি, তাকে স্থায়িত্ব দিয়েছেন। গানে-সুরে-কথায় যা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবজ্ঞাত হ'য়ে ছড়িয়ে ছিল, তাদের তিনি পাষাণমুক্তি ঘটিয়ে সজীবতা দান করেছেন। একক প্রচেষ্টায় এই বিপুল কর্মভার বহন বিস্ময়কর। অভিনব পরিকল্পনায় বিরচিত এই কোষগ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যের তথা সঙ্গীতের গৌরব বৃদ্ধি করবে এবং

in a bit different position. Thus *we see the sunrise before actually the sun rises.*

Another point is that *though the earth is almost spherical, we see it to be flat.* The cause is that a small portion of the perimeter of a very large circle can approximately be taken to be a straight line. The earth surface seems to be flat since we see a very small portion of it. *We shall see the earth to be almost spherical if we see it from Mars.*

Thus the world we see depends on where we are.

PUZZLES OF THE UNIVERSE—I

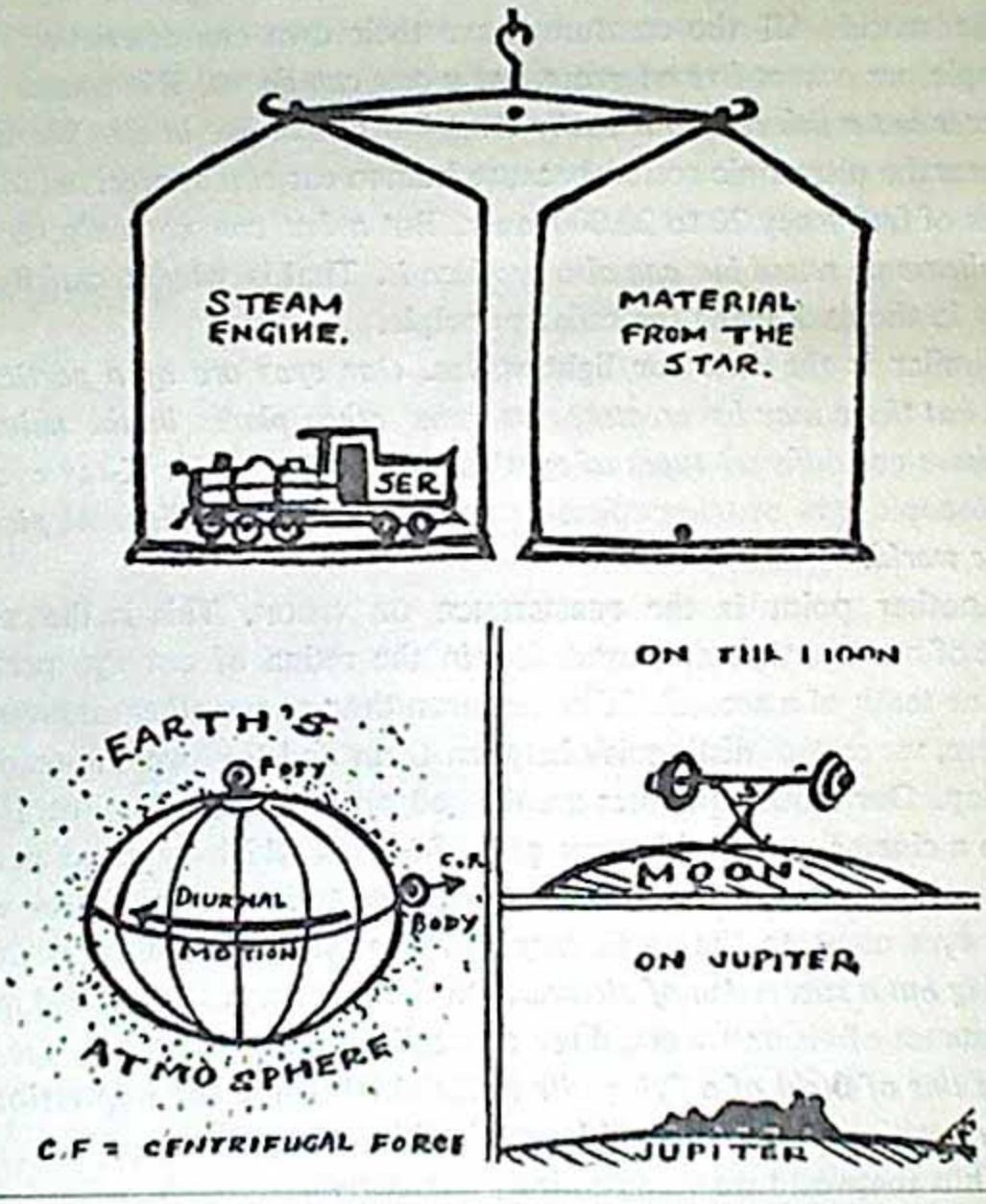

From time immemorial man has seen the sun rising in the east and setting in the west. It is due to the diurnal motion of the earth. But the fallacious conclusion was taken at that time that the *sun moved round the earth.* Later, of course, the HELIOCENTRIC THEORY was accepted where the sun was at the centre of the solar system. Thus actually *the earth moves round the sun.*

উপায় নেই যে বিশ্বের প্রতিটি সাহিত্যে এই ধরনের গল্প যুগে যুগে রচিত হয়েছে এবং রসজ্ঞদের আনন্দ দিয়ে আসছে। ভূতের গল্প পড়া উচিত নয়—ওতে মানুষের মন অকারণ ভীরু হ'য়ে যায়, এ সব তত্ত্বকথা শুনেও সাহিত্যিকরা ভূতের গল্প লিখতে দ্বিধা করেন নি, পাঠকরাও সাগ্রহে তার রসগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন। সম্পাদকের ভাষাতেই বলি—একটা "বিভীষিকাময় উৎসুক বাতাবরণ—নিদাঘের গভীর নিশীথে যখন সারা চরাচরকে অবসন্ন-অচেতন বলে মনে হয়, সেই নিবাত-নিষ্কম্প পরিমণ্ডলের ঘর্মসিক্ত বিনিদ্র উত্তেজনায়···বর্ষা রাতের মেঘ-বিদ্যুরির ঝিলিমিলি আর ঝড়ের উন্মত্ত মাতনে কিংবা শীতের হিমেল সন্ধ্যায় কুহেলী-মলিন আধো আলো আধো ছায়ার মায়াময় পরিবেশে ভূতের গল্পের গা-ছমছমানো অনুভূতি, যে-কোনো পাঠক, যে-কোনো শ্রোতার কল্পনাশ্রয়ী মনকে অক্লেশে আবিষ্ট ক'রে তুলতে সক্ষম। আর ভূতের গল্পের চরম সার্থকতা হ'ল সেইখানে।"

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একাধিক কথাসাহিত্যিক প্রধানতঃ এই ধরনের সাহিত্য রচনা ক'রে অমর হ'য়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে এড্‌গার অ্যালেন পো, ন্যাথনাল হথর্ন, লেডি সিন্থিয়া অ্যাস্‌কুইথ, আর্থার কনান্ ডয়েল, ডব্লিউ ডব্লিউ. জেকবস্, রাইডার হ্যাগার্ড প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা যায়। অবশ্য অন্য ধরনের গল্পও যে এঁরা রচনা করেন নি তা নয়—কিন্তু ভূতের গল্প রচনায় এঁরা সকলেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শেক্সপীয়ারের একাধিক নাটকে প্রেতাত্মার বিশিষ্ট ভূমিকার কথাও সাহিত্য-রসিক মাত্রই অবগত আছেন। এমন কি আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও বহু বিখ্যাত ভৌতিক কাহিনীর সঙ্গে আমরা পরিচিত। বিক্রমাদিত্যকে অবলম্বন করে বেতাল পঞ্চবিংশতি উপাখ্যানটিও এই রকম ভৌতিক পটভূমি দিয়েই শুরু করা হয়েছিল। রামায়ণ-মহাভারত থেকেও আমরা এ রকম ভূরি ভূরি নিদর্শন সংগ্রহ করতে পারি।

ভারতের অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেতলোক সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এদের মধ্যে প্রচলিত ভৌতিক কাহিনী—ভৌতিক উপকথার সংখ্যাও প্রচুর। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত তার কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করার সুযোগ রয়েছে প্রচুর।

অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গল্পলেখকের সংখ্যা হয়তো কম, কিন্তু তবুও কয়েকজন লেখক এ ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ভূত আছে কি নেই, পরলোক বলে যেটাকে বলা হয় সেটা আসলে কি রকম, মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়—মৃত্যুতেই কি তার শেষ, নাকি প্রেতরূপে "আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়" অবস্থায় কিছুদিন কাটিয়ে আবার তার কর্মফল অনুযায়ী সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে বা পরব্রহ্মে বিলীন হয়—এ নিয়ে নানা দেশে চিন্তাশীল দার্শনিকেরা

Picture of the Universe :

When we see a star in the sky, we should remember that *we do not at all see the star of this moment*, because the light sent by the star at this moment will reach us after that much of time which light takes to come to the earth from the star. Evidently we may not be living then and our future generation will catch the light.

You can easily understand that *amongst the stars living in the sky we see their pictures of many many years ago according to their distances from us*. Thus it is not possible for us to have the right picture of this universe just at this moment.

If just at this moment some intelligent creatures on some distant planet in the universe focus their 'extra-ordinary' 'powerful' telescope towards our earth, they may see the huge pre-historic creatures living on earth and they will not even be able to imagine us !

Again, the universe we see depends on our range of sight. So far we had only Astronomical optical telescopes. But now the Radio-telescopes have increased our range. We still do not know what is there beyond that !!

References :

1. *Astronomy Made Simple* by Meir H. Degani, Sc. D. New York.
2. *The Physics of Space* by Richard M. Sutton. New York.
3. *Biswa Parichaya* by Rabindranath Tagore. India.
4. University Physics Books.
5. *Relativity* by Albert Einstein.

Illustrations : The writer.

THE MYSTERIOUS VENUS

DULAL CHAKRABARTI
First Year, B. Sc. Class

Two planets are at the root of all kinds of curiosity of man and raise up the question whether life exists or not in any planet other than the earth. Many fictions have been composed on these two planets, describing many impossible journies. But actually, it is yet impossible to explain the nature of these two planets, specially of Venus, with the limited sources which the scientists have got at their hand.

কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা অপেক্ষাকৃত নতুন, তার উপর টেক্সট্ বই ছাড়া বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ের বই-এর খুবই অভাব। বলতে কি, টেক্সট্ বই-এর বাইরে এমন বই, যা থেকে ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক সহজে বিজ্ঞানের মূল কথাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন,—আমাদের দেশে খুব কমই লেখা হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সাধারণ পাঠকশ্রেণী এখনো তৈরী হন নি, তাই 'সর্বসাধারণের জন্যে বিজ্ঞান' বা পপুলার সায়ান্স-এর বই-এর প্রয়োজন খুব বেশী।

বিজ্ঞান-চেতনা এই অভাব মেটাবার পথে অনেকখানি সাহায্য করবে সন্দেহ নেই। যতদূর জানি, বহুদিন আগে জগদানন্দ রায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে সহজবোধ্য কয়েকখানা বই লিখেছিলেন। তার বহুদিন পর অনেকটা এই ধরনের আরও একটি সিরিজ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সে বইগুলির কোনটাই প্রায় আজকাল আর বাজারে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এ সব বই যখন প্রকাশিত হয়েছিল তারপর বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে যেমন নানা উন্নতি হয়েছে, আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষারও তেমনি বহু রূপান্তর ঘটেছে। মনে হয় এ সব দিকে নজর রেখেই ৬ খণ্ডে 'বিজ্ঞান-চেতনা' প্রকাশ করা হয়েছে।

'বিজ্ঞান-চেতনা'র প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে "আকাশের কথা" ও "পৃথিবীর কথা"। "আকাশের কথা" অংশে জ্যোতির্বিদ্যার গোড়ার কথা, তারা ও দূরবীন, সূর্য, সৌরজগৎ, বিরাট এ মহাবিশ্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। "পৃথিবীর কথা" অংশে পৃথিবীর চেহারা, পৃথিবীর উপাদান, পৃথিবীর ভিতরটা, মহাদেশ, ভূমিকম্প, পর্বত, মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ অংশ দু'টি লিখেছেন শ্রীশংকর চক্রবর্তী। লেখক এ খণ্ডে অনেক নতুন কথা শুনিয়েছেন, যা থেকে লেখকের বিদ্যাবত্তার পরিচয় মেলে। তবে লেখা যে সব সময় সহজ এবং সাবলীল হয়েছে এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। মাঝে মাঝে দুরূহ ভাষা প্রয়োগের ফলে আসল বক্তব্যের রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তা ছাড়া সাধারণ পাঠকের জন্য এ ধরনের বইয়ে কতটুকু দেওয়া উচিত—যাকে বলে মাত্রাজ্ঞান—সে বিষয়েও লেখক সর্বত্র সতর্ক হন নি। সম্পাদকেরও এদিকে একটু নজর দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে হয়। তবুও বইখানি পাঠকদের কিছুটা কাজে আসবে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় খণ্ডে "গাছপালার কথা" এবং "জীবজন্তুর কথা" অংশ দু'টির লেখক যথাক্রমে অধ্যাপক স্নেহাংশু সেন এবং অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ মিত্র। "গাছপালার কথা" অংশে গাছের খাবার, গাছের জীবনধারণ, পরভোজী গাছপালা, শেওলা, ছত্রাক, ফুল, ফল, গাছের বংশবৃদ্ধি এবং অন্যান্য নানা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রাণের প্রকাশ, প্রাণ থেকে প্রাণী, প্রাণিরাজ্য, প্রাণিদেহের মালমশলা, মানুষ ও প্রাণিজগৎ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে "জীবজন্তুর কথা" অংশে। দু'টি অংশই সুলিখিত।

'বিজ্ঞান-চেতনা'র তৃতীয় খণ্ডে "পদার্থবিজ্ঞানের কথা" এবং "রসায়নের কথা" অন্তর্ভুক্ত

Winner—B.A. (3rd year) 1967-68

Runners-up—B.Sc. (3rd year) 1967-68

Sitting on the chair (L to R)—Sailen Bhattacharya (Games Secy.), Prof. R. Ghosh (Prof.-in-charge, Sports), Prof. B. Chakrabarty (Prof.-in-charge, Games), Principal N. K. Bhattacharjee, Vice-Principal P. Sen, Prof. P. Roy (Prof-in-charge, Rowing)

সম্পাদকীয়

আমাদের কলেজ পত্রিকাটি এবার বিয়াল্লিশ বছরে পদার্পণ করল। সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে গেলে কিছু বক্তব্যও থাকে, তাই দু'-চার কথা লিখছি।

শিল্পসৃষ্টিতে একটা অন্তরাল আছে—এই অন্তরাল আবিষ্কারের পেছনে চাই রসবেত্তা মন। তবে তার প্রকাশ সাধারণের কাছে রুচিকর না-ও হতে পারে। তাই পত্রিকার পর্দার ভিতর দিকের খবর দিতে আমরা রাজী নই। তবুও স্বগতোক্তির মাধ্যমে দু'-একটি কথা বলব।

মৌসুমী বৃষ্টির মতই প্রাপ্ত রচনার সংখ্যা এবারে সুপ্রচুর। তবে দুঃখের বিষয় বিজ্ঞাপিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার অনেকগুলিই আমাদের হাতে এসে পৌছয় নি। কাজেই যথেষ্ট দ্বিধার সঙ্গেই আমাদের রচনা নির্বাচন করতে হয়েছে। নির্বাচনে আমরা প্রধানতঃ জোর দিয়েছি রচনার বৈচিত্র্যের ওপরে। তা ছাড়া পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় সীমিত পৃষ্ঠার বাইরে যাবার আমাদের উপায় নেই। সেজন্য ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ রচনাগুলিকে একটু ছাঁটকাটও করতে হয়েছে সময় সময়। এ ব্যাপারে আমাদের পত্রিকাধ্যক্ষের (তিনি একজন খ্যাতনামা অভিজ্ঞ সম্পাদকও বটেন) উপদেশ ও পরামর্শ আমাদের খুবই সাহায্য করেছে। তবে সম্পাদনার পূর্ণ দায়িত্ব তিনি আমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, নিজের মতামত আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। প্রাপ্ত লেখার মধ্যে কবিতার সংখ্যা সর্বাধিক। প্রবন্ধও কিছু কিছু এসেছে, অভাব যা-কিছু ভাল গল্পের। বৈচিত্র্যের জন্য আমরা সব রকম রচনাকেই স্থান দিয়েছি।

সাহিত্যের ভাষা, ভাব এবং আঙ্গিক যুগে যুগে বদলায়। বাংলা কবিতায়ও এই পরিবর্তন কিছুদিন থেকে বিশেষ ভাবে চোখে পড়ছে। কোন কোন প্রাচীনপন্থী এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও যুগকে অতিক্রম করা যায় না। কবিতা রসোত্তীর্ণ হ'ল কিনা সেইটেই বিবেচ্য বিষয়। কবিতা নির্বাচনে আমরাও এই সংস্কার-মুক্ত মন নিয়েই অগ্রসর হয়েছি। আমাদের নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কিনা তা রসজ্ঞ পাঠকরাই বিচার করবেন।

যেমন কবিতায় তেমনি গল্পের বেলায়ও আমরা কিছু পরীক্ষামূলক গল্পের স্থান দিয়েছি পত্রিকায়। এই গল্পগুলিতে পাঠক একটু ভিন্ন রসের আস্বাদ পাবেন বলেই

Venus is one of the three most beautiful brilliant objects visible us. The others are the sun and the moon. The reason behind su kind of brightness of Venus is that it reflects about 65 per cent of lig provided by the sun. This fraction of total light, reflected by a plan is referred to as the planet's *Albedo* in the astronomical language.

The albedo of Venus is so great that it becomes difficult for t astronomers to view it at night. For this reason Venus is general observed at broad daylight. It is most convenient to observe it befo the sunrise and after the sunset. Venus generally rises just a fe hours before the sunrise and sets a few hours after the sunset. S Venus is called the "evening star" and sometimes "morning star".

Another most interesting thing is the Venusian surface itse Despite the differences in theories about the Venusian surface, t most interesting and modern accepted theory is the "Dust-Bow theory. This theory states that the temperature of the Venusia surface is about 500°F and the storms of dusts and sands are scattere all over the surface with unbelievable ferocity. The velocity and the same time force of these hurricanes, as they are called, would be great that even the most dangerous storms in the deserts of the ear would appear like a gentle breeze in comparison.

Let us now see how far this theory agrees with the Venusia atmosphere. According to the Dust-Bowl theory, the Venusian surfa must be covered with sufficient sand which means that silicon dioxi is present in immense quantity in Venusian atmosphere. But actual wherefrom oxygen comes to make silicon dioxide ? This question of utmost importance before assuming the Dust-Bowl theory. Ev if it is said that in the earlier stage oxygen was sufficiently provid to form silicon dioxide, the question lies whether the transformati of oxygen to silicon dioxide is ended or not and why the oxyg atoms do not go away from the Venusian atmosphere in such temper ture instead of remaining there to form silicon-dioxide. Thus t only possible way remains to say that the particles are not sand all—they are different particles which are to be detected. The assu ption of storm may be considered because the difference of a va temperature can make a storm of great velocity.

The other theory about the Venusian surface is that it is cover by thick jungles and water is present in it. This theory is, of cours not supported by sufficient proofs. The existence of water means th the temperature must be sufficiently low. The background of th theory is that as the Venus' day is a longest one, its one side alwa faces the sun while the other always remains in an opposite directi

অসুন্দর—যা মেকি—তা কখনও ধোপে টিকতে পারে না। পুরোনো জুতোর মতই লোকে তা দু'-দিন বাদে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাহিত্য যদি কালজয়ী হতে পারে তবেই তাকে সত্যিকার সাহিত্য বলব। আশা করি কালই তার কষ্টিপাথরে তা যাচাই ক'রে বলে দেবে।

* * *

প্রসঙ্গান্তরে এসে প্রথমেই দুঃসংবাদ বহন করতে হচ্ছে। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং গুপ্ত আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন মাত্র ৩৯ বছর বয়সে। গান্ধীজীর ভাবশিষ্য এই নিগ্রো কর্মবীর বিশ্বে শান্তি স্থাপনে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন—বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর দুর্বার সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার সাবধান বাণী তাঁকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল। এমন একজন মহান্ ব্যক্তিকে হারিয়ে সত্যিই আমরা বেদনার্ত। তাঁর আত্মার শান্তি হোক্।

১৯৬৫ সালে এভারেস্ট-বিজয়ী সোনাম গিয়াৎসে পরলোকগমন করেছেন—তাঁর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি। মানা-বিজয়ী পাসাং ফুতারও পরলোকগমন করেছেন। ভারতীয় পর্বত-বিজয়ীদের অন্যতম পাসাং ফুতারের অবদান ভুলবার নয় —তাঁর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ দীর্ঘ রোগভোগের পর দেহত্যাগ করেছেন। বিশ্ববিশ্রুত এই শিল্পীর ভারতীয় সংগীতে অবদান সর্বজনবিদিত। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন সত্যিকার গুণী লোককে হারালাম।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাতঃকালীন বিভাগের (বর্তমান নাম যোগমায়া দেবী কলেজ) উপাধ্যক্ষ ৺বিভাস রায়চৌধুরীর আকস্মিক পরলোকগমনের সংবাদও বেদনার সঙ্গে পরিবেশন করছি। দীর্ঘদিন তিনি আশুতোষ কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অল্প কয়েক বছর আগেও তিনি ছিলেন আমাদের কলেজেরই একজন। সুসাহিত্যিক বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন তিনি। তাঁর বিয়োগে আমরা আত্মীয়বিয়োগের মতই শোকগ্রস্ত।

* * *

লক্ষ টাকার সর্বভারতীয় সাহিত্যস্বীকৃতি—জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর এই পুরস্কার-প্রাপ্তিতে সর্বভারতীয় সাহিত্যের আসরে এখনও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব আর একবার প্রতিপন্ন হ'ল। তাঁর "পঞ্চগ্রাম" উপন্যাসটির জন্যই এই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সম্প্রতিপ্রাপ্ত খবরে জানা গেল পরবর্তী বৎসরের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাচ্ছেন প্রখ্যাত গুজরাতী কবি ডঃ উমাশঙ্কর যোশী। ডঃ যোশী বাংলা ভাষায়ও সুপণ্ডিত।

will come or what sight Venus will offer us—whether an improved ar of human habitation or an unbelievable chaos of heated dust particl But it is my belief that Venus, named by the Romans as the godde of love and beauty, will inevitably disclose all her secrets to the endl efforts of man for exploring every part of the solar system. Let await that auspicious day.

WHEN SMRITI WOULD DANCE

AJIT KUMAR MUKHOPADHYAYA
Third Year, B. A. Class

The leaf trembles,
So Smriti
And so Suman.
What commotion in the moonlit flood ?

* * *

Every soul is busy—
Dancing on the dias
In motley attire,
The rose is splashed red with blood,
Even yet Smriti quivers—
to and fro.

* * *

Is touch everything ?—
Or, is there something beyond ?
Smriti dances,
Also Suman.

* * *

Smriti danced yester-night :—
Tonight she's absent, why ?—
She's doomed to widowhood,
Suman sleeps peacefully.

সম্পাদকীয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হয়েছেন বিখ্যাত অর্থনীতি-বিশারদ অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ডঃ সেন আমাদের কলেজেরই একজন প্রাক্তন অধ্যাপক—দীর্ঘদিন তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা ক'রে গেছেন। নিজে তিনি কৃতী ছাত্র এবং ছাত্রসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অনেকদিন থেকে। বর্তমান ছাত্রসমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে আসবেন তাঁর কাছে আমরা নিশ্চয়ই এ আশা করব। একজন অধ্যাপক ভাইস্-চ্যান্সেলার হিসেবে এবং আমাদের প্রাক্তন অধ্যাপক হিসেবে তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

এ বছর খেলাধুলায় আমাদের কলেজের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের কলেজ 'রোইং' বা নৌকাচালনায় চ্যাম্পিয়ন হ'য়ে আসছে। এ বছরও অন্য কোন কলেজ তাকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি। উপরন্তু নক্-আউট এবং লীগ দু'টিতেই আমাদের কলেজ রোইং চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আন্তঃ-কলেজ হকি লীগ প্রতিযোগিতায়ও আমাদের কলেজ এ বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এস. আর. দাশগুপ্ত কাপ প্রতিযোগিতায় হয়েছে রানার্স-আপ। আরও একটি বড় খবর এবং আনন্দের খবর হচ্ছে এ বছর আন্তঃকলেজ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ক'রে সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট পেয়ে আমাদের কলেজ 'স্টেট্স্ম্যান ট্রফী' বিজয়ী হয়েছে। আর আমাদের কলেজই সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করল। ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েট লিফটার্স অ্যাণ্ড বডি বিল্ডার্স আয়োজিত স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন আমাদের কলেজের বর্তমান করণিক এবং প্রাক্তন ছাত্র শ্রীভূতনাথ ভট্টাচার্য। কালীঘাট ব্যায়াম সমিতি আয়োজিত বিজয় বসু মেমোরিয়াল ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

খেলাধুলার মত লেখাপড়ায়ও আমাদের কলেজের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায়—বিশেষতঃ বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক অনার্স পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রেরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রসায়ন শাস্ত্রে অনার্সে (ফাইনাল) এবারেও দু'টি ছাত্র প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েও ফলাফল গৌরবজনক। মোট কথা, দক্ষিণাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে এর ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে ছাত্রেরা ত্রুটী করেন নি।

* * *

আবার পত্রিকা প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। শক্তিশালী ছাত্রদের রচনা প্রকাশে উৎসাহ দেবার জন্যই আমাদের এই পত্রিকা—তাই বেশীর ভাগই ছাত্রদের রচনা

opportunity to visit underground mines and also to see the ore concentration plant located in the mining area.

Field work is an essential part of the study of Geology and so the Department is actively considering the question of arranging more field programmes for the students. Besides the normal routine work, some of the teachers of the Department, viz. Prof. A. K. Roy, Prof. A. K. Mitra, Prof. A. K. Sen, are carrying on research work and making out publications from time to time.

"You give me slavery with one hand and money with the other. I despise the offer. I will not take the money. We shall retrench and we shall live within our means. We will starve. We will go from door to door, all through Bengal. I will ask my post-graduate teachers to starve their families but to keep their independence... I tell you as members of this University, stand up for the rights of the University. Forget the Government of Bengal. Forget the Government of India. Do your duty as senators of this University. Freedom first, Freedom second, Freedom always."—Sir Asutosh Mookerjee

ASUTOSH COLLEGE CRICKET FESTIVAL MATCH (1967-68)

Teachers Vs. Students

Winner—Teachers

Standing, 1st Row (*L to R*)—S. Bhattacharya (Games Secy.), S. Paul, A. Sengupta, N. Sanyal, A. Chatterjee, S. De, R. Mukherjee, T. Ghosal, A. Saha, P. De Sarkar, P. Roy

Standing, 2nd Row (*L to R*)—S. Pathak, Prof. P. Roy, Prof. B. Bhattacharya, Prof. B. Bhattacharya, Prof. S. Banerjee, Prof. S. Bhadury, Prof. P. Roy Chowdhury, Prof. R. Ghosh, S. Mukherjee

Statement about ownership and other particulars of the Asutosh Co
Magazine :—

1.	Place of publication	...	Calcutta.
2.	Periodicity of publication	...	Yearly
3.	Printer's Name	...	Principal, Asutosh College.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	92 Shyamaprasad Mookerjee Ro Calcutta
4.	Publisher's Name	...	Principal, Asutosh College.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	92 Shyamaprasad Mookerjee Ro Calcutta
5.	Editor's Names	...	(1) Ajit Kumar Mukhopadhyaya (2) Ranadev Sarkar
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Asutosh College, Calcutta-26
6.	Names and Addresses of the individuals who own the newspaper or publication	...	Asutosh College

I, Nirod Kumar Bhattacharjee hereby declare that the particulars given abo
are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./- N. K. Bhattachar
Publisher,
Asutosh College Magaz

The magazine is printed and published in the official capacity of the Principal. The name of the Principal is Nirod Kumar Bhattacharjee.

ASUTOSH COLLEGE
(ESTD 1916)
LIBRARY

A GEOLOGIST'S APPROACH

PROF. A. K. ROY
(Department of Geology)

ONCE an eminent ex-Head of the Department of Geology of Presidency College, Calcutta, told a fine little story to his first year students. The story was as follows :

One day a philosopher, a chemist, a physicist and a geologist went out together in an excursion. After going round a small distance, they saw a horse grazing in the field. The philosopher asked the chemist, "Friend, the horse looks white, but what is its actual colour ?" The chemist replied, "The colour is as white as the precipitate of silver chloride". The philosopher was not satisfied and he asked the same question to the physicist. The latter replied, "The colour is white but the short length-waves reflected therefrom are more absorbed in the atmosphere before reaching our eyes." The philosopher was now perplexed. He then turned to the geologist and said, "Can you tell me what is the true colour of the horse ?" The geologist promptly answered, "No, sir, I cannot, because we are looking at only one side of the horse. I don't know the colour of the other side".

It is needless to mention over here that the story is a mere joke and it should not prejudice one's mind about the value of any branch of science. Yet this simple amusing tale seeks to reveal a very important truth. It demonstrates that incomplete data can give us only partial knowledge. A scientist should neither jump into a final conclusion based on such incomplete kowledge, nor should he make any final commitment or build up his theories.

A geologist is first of all a fact finder, a data collector and a painstaking observer of nature and only then a theorist. He has to work in the laboratory of nature in which all the things like rocks, minerals, fossils, mountains, rivers, oceans, volcanoes etc., are made by nature herself—the owner of the laboratory. It is none but nature who really knows the processes, complexities and the secrets of her laboratory. A geologist is like a trespasser into this laboratory possessing a few keys borrowed from the physicists, chemists, botanists, zoologists, mathematicians and statisticians. He tries to open the desks, open

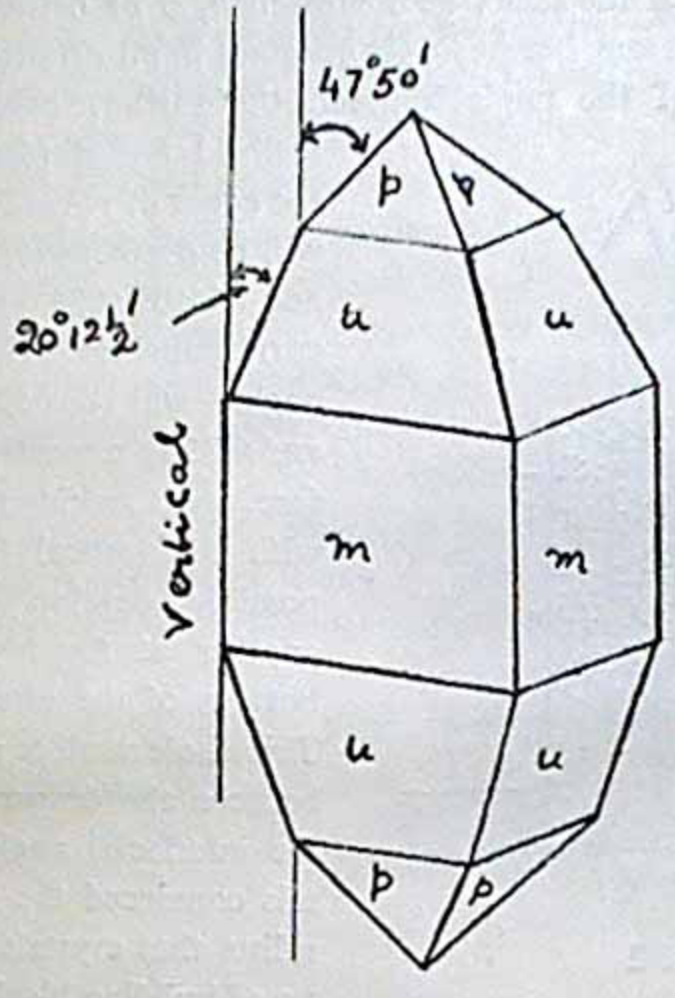

Fig. 1

ship that we are considering now. Let us follow Haüy to derive some conclusions from the whole number relationship between the tangent values of the interfacial angles of crystals.

Suppose some bricks are stacked and a board is placed against the edges of the bricks so that the board makes an angle 20°12½' with the vertical plane as shown in the Fig. 2. (Page 92).

The tangent of 20°12½' is 0·36804. Now if we make another stack as shown in the Fig. 3 (P. 92), in which the width of each layer is increased 3 times keeping the total number of layers constant, then a board placed against the edges of bricks in the stack will make an angle 47°50' with the vertical plane, the tangent of which is 3 times the tangent of 20°12½'.

Nevertheless Haüy did not give up his idea which was based on his own observations. He explained that the building blocks are so small that they cannot impart any irregularity or unevenness to the crystal face. Light is scattered at the surface of a ground glass because of its roughness or irregularites and thus they become visible. But the irregularities of a crystal face are of such a small order that there is no scattering of light on a crystal face. Therefore, it follows that the irregularities are somewhat less than the dimension of the wave-length of light (shortest wave-length of visible light is $3{\cdot}8\times10^{-5}$cm and the longest wave-length is $7{\cdot}6\times10^{-5}$cm).

Until the first decade of the 19th century, the wave-lengths of light waves were unknown. But, based on the data from precise measurements of interfacial angles, Haüy and his followers discovered that the building blocks or the internal pattern units of the crystals were smaller than 10^{-5} cm. They also classified the building blocks into seven types and determined their shapes. These types are called (1) Cubic (2) Tetragonal (3) Hexagonal (4) Rhombohedral (5) Orthorhombic (6) Monoclinic (7) Triclinic.

Recent studies in x-ray crystallography have not only confirmed the ideas of the naturalists about the structure of the crystals but have solved many unsolved questions.

X-rays are much smaller electro-magnetic waves than the light waves. So the faces of crystals, which in spite of their unevenness (caused by the building blocks), behave perfectly smooth against light waves, can produce scattering of waves against x-rays. When a beam of x-rays enters a crystal, each atom of the crystal scatters the x-rays in all directions. X-ray photographs of a crystal show that there is a three-dimensional array of atoms. This atomic network can be divided into a large number of very small units of identical shape, each unit being constituted by a group of atoms. Such units are called unit cells which were first comprehended by the naturalists as the building blocks of crystals. The pattern of arrangement of atoms in the unit cell as well as the cell size can be determined by x-ray crystallography.

The unit cells are classified into seven types, viz., Cubic cell, Tetragonal cell, Hexagonal cell, Rhombohedral cell, Orthorhombic cell, Monoclinic cell and Triclinic cell and they correspond to the seven systems of crystals. The external morphology of the crystals are only the expressions of the shapes of their unit cells or building blocks and this fact was discovered by the naturalists by their painstaking observations long before the discovery of x-rays.

So careful observation is the first and the last task of a geologist

private sector and thus the proper control of the public sector proves difficult. Framing of production plan of public sector is, however, possible but in the private sector where production depends upon the wish of an individual entrepreneur, with his eyes on profit, the mere existence of a plan is of no use.

As the Govt. has no power to compel the private sector to follow a particular line of action or take up any production plan, the organised public sector serves the purpose of filling the gap. The public sector comes in where private sector is either not allowed to operate in the interest of a Welfare State or is unable to contribute efficiently towards industrial development. More precisely, it may be said that the investment in public sector is normally directed towards key points in the economy leaving the remaining parts to the whims of private capitalists in spite of controls here and there. As the Govt. does not exercise power in every sphere of economy there is no overall centralised planning in India. Thus in spite of careful planning our economy more or less tends to be a free-sailing economy. This is the main defect in our economic system. Planning is named by modern economists as 'law of production'. It is, therefore, obvious that planning in India may, in spite of being a law of production ends as pious wishes with investment projects undertaken by the Govt. to supplement the private sector.

Next comes the problem of lack of co-ordination between the physical target and financial resources of the plan. There are two sections in a plan. The first portion shows the physical target to be attained within a specific span of time with some given amount of resources, while the second part shows the cost to be incurred to attain the target. The two aspects of the plan should be carefully worked out. But very often a difference between the physical target and financial resources is found in our planning. Our planners concentrated too much on what could be done and too little on how it could be done. They went on building a castle in the air. This can be termed as the crisis of ambition.

Lack of definite ideology is also responsible for the failure of the plan to some extent. If there is a definite ideology and if all the people of the country are under the influence of that ideololy (either capitalism or socialism), the planned development would have been much more successful.

Economic development of a country cannot depend on the efforts of a few individuals or group of individuals, however highly they may be planned. Unless the people as a whole accept a system and give a

Then comes the problem of 'deficit financing'. Deficit financing is not inflationary when the Govt. purchases against it cash balance foreign exchange from the Central Bank for financing imports. Deficit finance is also not inflationary if the production increases in every field of the economy so as to justify adequate amount of supply of money. But at the time of foreign exchange crisis, deficit financing is detrimental to the interest of the country. Deficit financing makes planners over-ambitious. It is to be remembered that deficit finance has been introduced in our economy from the Second Plan period but till now no remarkable progress in the field of production has taken place.

It is devaluation which is one of the causes of failure of the plan. It is due to the devaluation of the Indian rupee import prices have risen up. As a result small-scale import-based industries will have to pay 36% more for the price of imported materials. This will be the cause of rise in price in the internal market. Secondly, our export structure is not much diversified. Agricultural goods and agro-industrial product dominate Indian export market. The market of these goods are not at all elastic. After the devaluation of rupee the demand for these goods has not increased and as a result of this Indian export earnings have still remanined unsatisfactory. Thirdly, more money will have to be paid for royalties in foreign collaboration. If price inflation is not checked, benefits from devaluation will be nothing. But our Govt. has failed to check the price level. It has become a common secret that India Govt. has devalued her rupee due to the pressure of the world bank. This measure was severely criticised by Prof. S. N. Sen—"it would adversely affect the imports. Its impact would also be severely felt on the country's internal economy in which the inflationary trend has already manifested." It is due to the devaluation that plan expenditure has also increased. It has also been proved by recent position of our economy that devaluation contains no magic formula to accelerate the rate of production of export industries.

There are many other defects in our planning. I have tried to refer to some of the fundamental defects in this connection in my preceding paragraphs.

It is our planners who say that the First Plan has failed. But at the time of the formulation of the Second Plan investment of money was increased, but the plan was executed by the same organisational set-up of the First Plan.

The inevitable result was the failure of the plan. Same fate was met by the Third Plan also.

Weight of a body :

The weight of a body on earth is the force with which the body is attracted by the earth. Now, is the weight of a body constant ? *Will your fountain-pen weigh the same everywhere on the earth or everywhere in the universe ?*

To find the answer to this question, let us first see what is CENTRIFUGAL FORCE. When you are in a motor car moving along a curved path you feel some force trying to take you away from the centre of curvature of the path. This is the centrifugal force. The greater your mass and velocity, the greater is the force. Again the smaller the radius of curvature of the path, the greater is the force. To balance this centrifugal force a cyclist moving along a curved path leans towards the centre of curvature of the path.

Apparent weight :

Now, since the earth is rotating about its axis, a body at the equator is moving in a circular path and so it experiences a centrifugal force directed away from the centre of the earth. This force acts against the pull of earth. But for a body at the pole no such centrifugal force due to earth's rotation will be there. *Thus the apparent weight of a body is greater at the pole than at the equatorial region.* Again the body at the pole is nearer the earth centre because the equatorial radius is greater than the polar radius by about 13·5 miles. This is another reason why the weight of a body increases as we go from the equatorial region to the polar region. *Again the weight of a body decreases when it is taken away from the earth surface.*

On other planets and satellites :

Moon is the natural satellite of the earth. It is much smaller than the earth. So we shall have less weight (only $\frac{1}{6}$th of that on earth) on the moon. Thus *even a young boy will lift a heavy barbell standing on the surface of the moon.*

Similarly, our weight will be increased many times when we stand on the planet Jupiter which is far more massive than the earth. So *we shall perhaps not be able to balance to stand on Jupiter's surface and we shall have to crawl.*

Weightless state :

If you start from the earth's surface in a rocket with acceleration 'f' upwards, then your apparent weight will be $m(g+f)$ where 'm' is

On the other hand, there may be such *a planet where there are intelligent living beings like us or they may be far more advanced as compared to us.* Nothing impossible !

The World We see :

The world we see is the world of light. Visible light waves are a portion of the ELECTROMAGNETIC WAVE family. When the light waves produced by a source or reflected from an object reach our eye and the stimulations reach our brain, we see the thing.

Now we have seen that there are innumerable types of creatures in the world. All the creatures have their own characteristics. For example, *we cannot live on grass, but a cow can do so. We cannot live in water but a fish can do it easily though it cannot live in air.* We cannot hear the ultrasonic sound because human ear can appreciate sound waves of frequency 20 to 20,000 only. But *a bat can not only receive the ultrasonic sound but can also produce it.* That is why it can fly so easily in the dark using the radar principle.

Similar is the case for light waves. *Our eyes are of a particular type, but there may be creatures at some other places in the universe who have got different types of eyes* such as radio-eyes or X-ray eyes or microscopic eyes or telescopic eyes and *they will see a different picture of the world.*

Another point is the PERSISTENCE OF VISION. This is the weak point of our eye that an impression in the retina of our eye persists for one-tenth of a second. If in the mean time some other impression is there, we cannot distinguish between them and the two impressions overlap. Our motion pictures are devised on this principle. But if we go to a cinema show with very powerful eyes which have no persistence of vision then our romance would go to hell. If creatures with such eyes come to the earth *they will see the motion pictures to be nothing but a succession of pictures.* On the other hand, if we had more persistence of vision we could see a peculiar world. *We could see the whole line of flight of a flying kite* in the sky because the impression of every position of the kite will be retained in our eye.

Thus the world we see is entiraly SUBJECTIVE.

Again, if we go to the moon and look towards the moon-sky with our normal eyes, *we shall see a black sky even at day time with the sun blazing in the dark background.* The cause of this is that the moon has no atmosphere.

Again the lights from the sun, the moon and the stars are refracted when they enter the envelope of the earth's atmosphere.

PUZZLES OF THE UNIVERSE

When you see an aeroplane flying high up in the sky, it seems to you to be merely a toy. But when it comes down you see it so big ! In fact, anything from a distance seems to be smaller. Similarly, though the stars twinkle like diamonds, you cannot imagine how big they are and at how long distances they are situated !

This earth is nearly of 4,000 miles radius. The sun is 1,250,000 times greater than the earth in volume. But it seems only to be a burning disc in the sky because it is 93 million miles away from the earth. The sun is only an ordinary star.

PUZZLES OF THE UNIVERSE—2

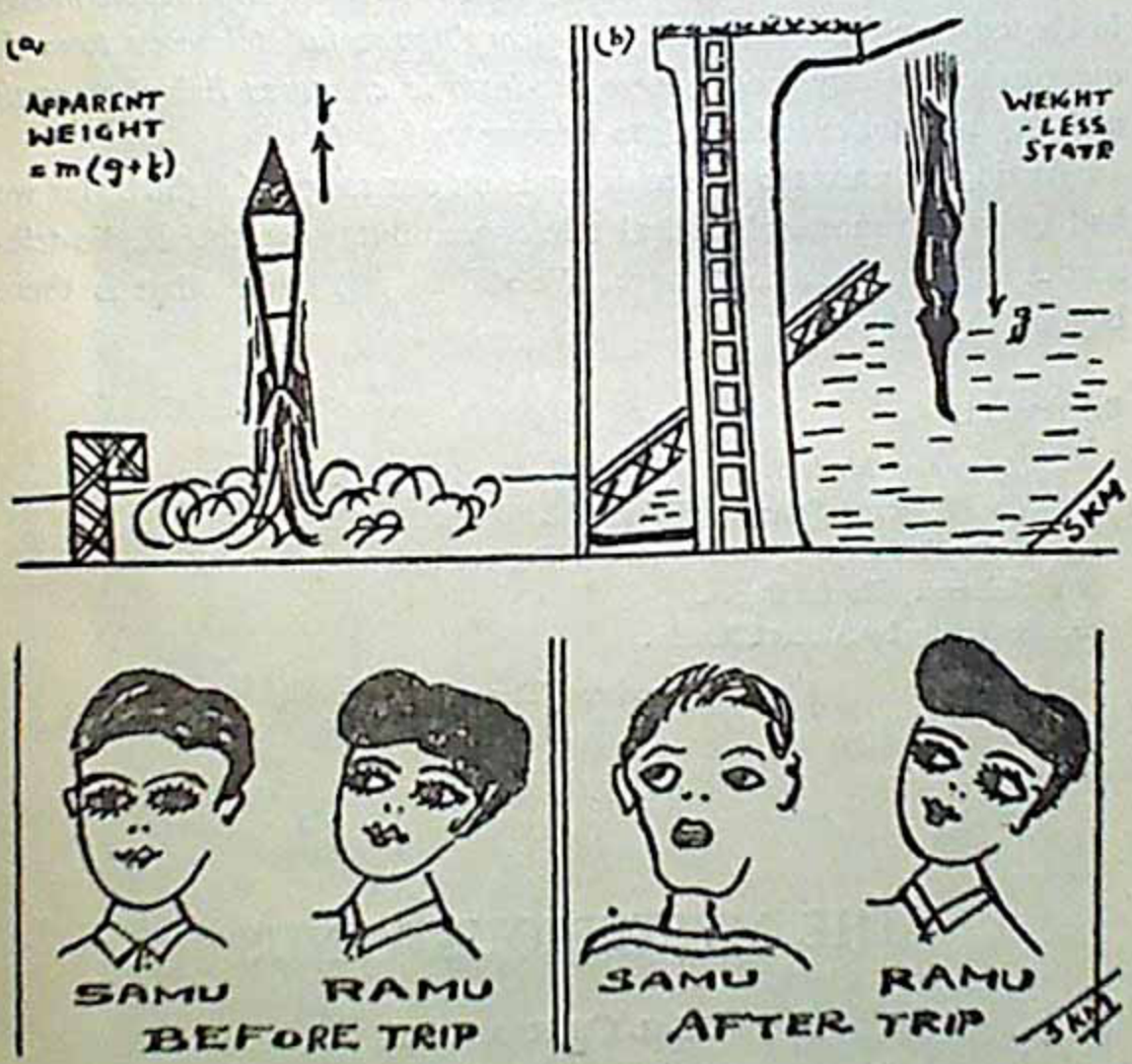

Other stars are many many light years away from us. A LIGHT YEAR is the distance travelled by light in one year with a velocity of 186,000 miles per second. The star ALPHA CENTAURI, which is the nearest star to our solar system, is 4·3 light years (25,000,000,000,000 miles) away from us. The distances of the other stars are hundreds and thousands of light years which can better be imagined than described.

ASUTOSH COLLEGE ATHLETIC CLUB

Winner— Statesman Trophy, 1967-68

Standing, 1st Row (*L to R*)—S. Mukherjee, S. Mukherjee, T. Chatterjee, B. Dutta, P. Chakrabarty, T. Seth

Standing, 2nd Row (*L to R*)—P. De Sarkar, N. Singh, A. Palit, J. Ghosh, B. Roy Chowdhury, P. Guha, S. Mitra, S. S. Manna, T. Das, A. Mukherjee

Sitting (*L to R*)—K. Saha (Gen. Secy. S. U.), Prof. P. Roy (Prof.-in-charge, Rowing), Vice-Principal P. Sen, Principal N. K. Bhattacharjee, S. Bhattacharya (Games Secy.)

The positions of both the planets which have awakened our curiosity about the existence of life upon them are really mysterious. One is just before the earth, while the other lies behind. The reason may be that they are our neighbours. It is very natural that one will be tempted to ask the reason for such insufficient availability of information about Venus.

The first and foremost bar on exploring the Venusian surface is that our planetary neighbour is covered for ever by a thick blanket of cloud, so that it is quite impossible to get any knowledge normally from the observatory. Venus is frequently called as the twin of the earth for centuries. Despite the insurmountable differences between the earth and Venus, the similarities between these two are also observable. The diameter of Venus is approximately 7,800 miles, while that of the earth is 7,926 miles. So from a physical outlook, the two planets can be called identical in size and mass.

The eccentricity of the Venusian orbit is so small that it can be said that Venus travels almost along a circular path, so that it takes about 225 earth days to complete a revolution around the sun. The orbital velocity of Venus is about 21·5 miles per second whereas the earth's orbital velocity is about 18·5 miles per second. One most important thing about Venus is that it has no days like so-called earth days. The reason behind it is that still the period of rotation of Venus about its own axis is unknown. The Radar Survey in 1962 shows that it rotates very slowly about its axis—once in about 250 days. Not only this, the Venusian motion is also retrograde. The retrograde rotational motion of Venus means that its rotation is in opposite direction to that of earth's.

After every 584 earth days Venus reaches a position in its orbit, which is only 24 million miles from the earth's orbit. This position is referred as *Inferior Conjunction* of the planets. At the superior conjunction, Venus is approximately at a distance of 161 million miles from the orbit of the earth.

The Venusian atmosphere is also equally mysterious like its strange shape, size and rotation. It has been found that the carbon dioxide, which man exhales mainly constitutes the Venusian atmosphere. The presence of water vapour and nitrogen has been detected in the Venusian atmosphere. But we are yet to know what are the actual constituents of the thick blanket of clouds which cover the Venusian atmosphere. It is believed that this blanket of clouds is constituted by carbon dioxide, water vapour and substantial quantity of suspended solid and liquid matters.

to the sun. So there may remain the existence of water in some regions which maintain an appreciable temperature in which water may exist amidst the highly hot and cold regions. But this, however, does not prove the existence of water because whenever we say of water, we are to think of the existence of oxygen. But it has been repeated, time and again, that there is still no sufficient proof of existence of oxygen in Venus. A few years ago another theory stated that the Venusian surface is full of vast pools or even seas of petroleum etc. This theory is, no doubt, a fascinating one. But we are yet to get that confidence by which we can neglect any theory because still we have limited information about Venus.

As we have proceeded so much about the Venus, let us once examine whether life can exist in Venus or not. This presupposition appears to be an unrealistic one as is seen in case of Mars. From the above discussion the simple conclusion which we have found is that the presence of oxygen in the Venusian atmosphene is a hypothetical one and so the presence of human beings is also impossible. Moreover, there is the scorching temp. of 500°F which is the bar on the existence of human beings. Now the question is whether there survives any kind of life. This question is very difficult to answer. First of all, the origin of life is still unknown to us and so it is impossible for one to answer whether any kind of life can survive at all without the presence of oxygen. Instead of proceeding further in such a controversial discussion, let us presume that some kind of life may exist in Venus. It is, of course, obvious that if the "Dust-Bowl" theory is true, there can in no way remain the existence of life. On the contrary, if the next theory is true, life is sure to exist in Venus.

So the best course will be to start an exploration of Venus itself. This programme has been started recently. The first successful U.S. Venus-probe was Mariner II, just after the unsuccessful launching of Mariner I. It took 109 days to reach the Venusian orbit and the rocket reached there on December 14, 1962, whereas its launching date was August 27, 1962. Among the interesting information so far collected, it discovered no magnetic field associated with the planet, found that the mass of Venus is '81,486 times that of the earth and determined a few particles, fully magnetised, which are revolving around it.

The difficulty in exploring Venus is that it is the largest planet in the solar system without having a moon. But, whatever may be the difficulty, it is our belief that man will surely peep one day from his space-craft upon the Venusian surface. We do not know when the day

REPORT : GEOLOGICAL ASSOCIATION AND GEOLOGY DEPARTMENT

ASUTOSH College Geological Association is one of the oldest academic bodies of the students of this college organized to grow students' interest through varions extra-curricular activities like study circle, field trip, exhibition, film show, etc., for the study of the earth-sciences. Although much can be said about the success of the Association in the past, it is regretted to note that in the recent years its activities were too few and limited to be reported at length because of various reasons. It is for the students of Geology to find the causes as well as the solutions to this problem provided that they desire to revive the Association and restore its formal stature.

During 1967-68 the Association published two issues of the wall paper titled 'Prithwi Parichay'.

Students of the Geology Department carried out geological field work in four different batches in 1967-68.

During the Puja vacation in the month of November 1967, the Second Year (Hons.) students carried out geological mapping and studied the mineral deposits around Tiluri, Bankura district, West Bengal, under the guidance of Prof. A. K. Roy and Prof. A. K. Mitra and the Third Year (Hons.) students, headed by Prof. G. Ghosh and Prof. A. K. Sen, visited Ramgarh coal mines in the Hazaribagh district, Bihar, Christian mica mines of Kodarma, Bihar, manganese and iron mines at Barabil and Bolani in Keonjhore district, Orissa, and studied the mode of occurrence, mining methods and commercial values of the deposits of those places.

In March 1968, the Third Year (Pass) students, led by Prof. A. K. Sen, went to Maithon and carried out geological work around the dam site. During the same period the First Year (Hons.) students were taken out by Prof. A. K. Roy and Prof. G. Ghosh to Rangpo, a nice little town at an altitude of about 3,000 feet in the South-Western Sikkim for geological reconnaissance work. There is a copper mine at Rangpo owned by the Sikkim Mining Corporation, which is a joint undertaking of the Govt. of India and the Govt. of Sikkim. The students had the

LIST OF EDITORS

1946-1967

Editor-in-chief ; Pijuskanti Chatterjee, Arun Kumar Dasgupta, Naresh Chandra Ghosh, Suhas Kumar Roy, Ramprasad Chakravarty, Amal Kumar Chakravarty, Miss Samjukta Kar and Miss Srimati Chakravarty (1946)

Editor-in-chief ; Sobhanlal Mukherjee, Arun Mukherjee, Asoke Sengupta, Asoke Chatterjee, Ranjit Ganguly, Sukumar Banerjee and Miss Pushpanjali Sen (1947)

Editor-in-chief ; Tejen Guha Roy, Miss Nilima Bose, Miss Bithi Sen, Sunil Dasgupta, Pratul Bardhan Roy, Prithwish Roy-Choudhury, Pranakrishna Bhattacharya and Bireshwar Banerjee (1948)

Satyen Mukherjee and Miss Jayasree Choudhury (1949)

Madhusudan Ghosh (1950)

Arun Kumar Roy (1951) ; Smritibikash Ghosh (1952)

Dulal Das (1953)

Gopal Chandra Banerjee (1954)

Samarendra Sengupta (1955)

Ashim Sengupta (1956)

Malayasankar Dasgupta (1957)

Ajay Gupta (1958)

Tripti Kumar Chatterjee (1959)

Gopal Bandyopadhyay (1960)

Sukanta Kumar Roy (1961)

Barun Kumar Banerjee (1962)

Jayanta Kumar Roy, Amit Kumar Ganguly (1963)

Asim Thakur, Suprakash Saha (1964)

Satyabrata Sanyal, Bhabesh Ch. Basu (1965)

Bhagirath Misra, Hiraksubhra Pandey (1966)

Ajit Kumar Mukhopadhyaya, Ranadev Sarkar (1967)